এ ও ত

"এ ও তা"-র প্রচ্ছদ এঁকেছেন বন্ধু ও শিল্পী

সুধাংশু চৌধুরী

এ ও তা।

প্রভু গুহ-ঠাকুরতা

প্রকাশক :

সুভো ঠাকুর—ফিউচারিষ্ট্ পাব্লিশিং হাউস্

৬।১এ, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেইন্, কলিকাতা

সোল সেলিং এজেন্ট—**ডি, এম, লাইব্রেরী**

৬১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৪৩

মাষ্টারি না কোরে লিখে দু'পয়সা রোজগার করা অনেক ভালো এ-কথা যে আমায় বিশ্বাস করিয়েছিল, তাকে ছাপার লেখায় কৃতজ্ঞতা জানাবার এই প্রথম সুযোগ হোলো "এও তা" লিখে।

रसो वै सः
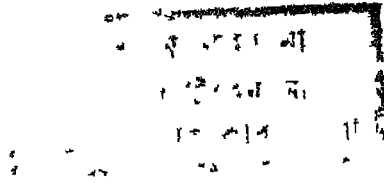
এ ও তা প্রবন্ধের বই। সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা, এক সঙ্গে পুস্তকাকারে বের হোচ্চে ব'লে রচনাগুলি সমালোচনা-সাহিত্যের অন্তর্গত হোয়ে পড়ে।

যে-সব লেখকের লেখা নিয়ে সমালোচনা, তাঁরা প্রত্যেকেই সমসাময়িক ইয়োরোপের নামজাদা রস শিল্পী, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্য-সাহিত্যের কোনো না কোনো বিশিষ্ট দিকের যুগ প্রবর্ত্তক: প্রত্যেকেই যুগ-রহস্য-সন্ধানী। বর্ত্তমান-যুগের ইয়োরোপের সাহিত্য ও রস-শিল্পের ওপর এঁদের ব্যক্তিগত ও দেশগত চিন্তাধারার প্রভাব খুব বেশী, এবং তা-ই যথাসম্ভব বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে চেষ্টা ক'রেচি।

অনেক বাঙালী পাঠক এঁদের সবারই সঙ্গে হয়তো কিছু কিছু পরিচিত, না হোলেও পরিচিত হওয়া উচিত।

প্রত্যেক প্রবন্ধেই এক-একটা দেশের সেই সময়কার নতুন সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপটি নির্দ্দেশ করার-ও চেষ্টা ক'রেচি। প্রবন্ধগুলিকে, সমষ্টিগত ভাবে বিচার ক'র্‌লে, হয়তো আজকালকার বিদেশী রস-সাহিত্যের মূলসূত্রটি-ও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বাঙ্‌লা দেশে আজকাল নাকি অতি-আধুনিকদের যুগ চল্‌চে, এই অতি-আধুনিকতার মূলে বিদেশী সাহিত্যের আকর্ষণ ও ছায়াপাতই যে খুব প্রবল, তা বোধ হয় সবাইর আগে অতি-আধুনিকেরাই স্বীকার ক'রবেন।

বাঙ্‌লার তরুণ সাহিত্যিকদের ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ক্ষুধা দেখ্‌চি প্রচণ্ড: কখনো তাঁদের খোরাকের অভাব হয় না, কেননা, যেখান থেকে তাঁরা খাদ্য আহরণ ক'র্‌চেন, সেখানকার ভাণ্ডার অফুরন্ত। কিন্তু অনেক সময় যে তাদের খানিকটা বদ-হজমও হোয়ে যাচ্চে সেটা খাদ্যের দোষ নয়, অপরিমিত ভক্ষণের দোষ। কারণ, অতি-আধুনিকেরা পথ্য, অপথ্য, কুপথ্যের বাচ-বিচার করেন না।

সে যাই হোক্‌, অতি-আধুনিক সাহিত্যের যথাযথ বিচার বা অতি-আধুনিকতার আসল সত্য-নির্ণয় এখন পর্য্যন্ত ভালো ক'রে

হোয়েচে ব'লে মনে কবি না। সেটা বাঙ্‌লা দেশের পাঠকের সন্দিগ্ধতা ও অসহিষ্ণুতাব জন্মই হোক্, কিংবা সাহিত্য-বিচারকদের উদারতাব অভাবেই হোক্। অতিরিক্ত নিন্দা ক'রে অতি-আধুনিকদের অযথা যে-সম্মান দেওয়া হোয়েচে সেটা এক হিসাবে যেম্‌নি হাস্তকর, তেম্‌নি তাদেব আমূল উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টাও হোয়েচে শ্রমবাহুল্য।

সাহিত্যের আগাছা দূব কববার জন্মে কখনো মালীর দরকার হয় না: নিকৃষ্ট সাহিত্য আপনিই শুকিয়ে যায়। ঔদাসীন্মই নিকৃষ্ট সাহিত্য-বচনার সব চেয়ে বড়ো শোধক। সাহিত্যেব স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, সম্মার্জ্জনী দিয়ে আঘাত ক'বে তাব আবর্জ্জনা অপসৃত করা যায় না, সাহিত্যে যা মেকি ও ভেজাল তা চিবস্থায়ী হোতে পাবে না।

আসল কথা হোচ্ছে এই: বাঙ্‌লা দেশে এখনো ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সমালোচনা-সাহিত্য গড়ে ওঠেনি। এক ববীন্দ্রনাথ ছাড়া আব কারুর রচনায় তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও সুললিত রস-বোধ বড়ো একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। বাঙ্‌লা সাহিত্যে অবিশ্যি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও তুলনা-মূলক আলোচনা কিছু কিছু হোয়েচে, কিন্তু সেগুলি হয় লিখন-ভঙ্গীর গুরুগাম্ভীর্য্যে আড়ষ্ট, নয়তো পাণ্ডিত্য ও বাগাড়ম্বরের জটিলতায় আচ্ছন্ন।

সে-সব বচনাব মর্ম্মোদ্ধাব কবা সাধাবণ পাঠকেব পক্ষে সম্ভব নয়। পাঠকেব চাইতে সমালোচকের জ্ঞানের পবিধি হয়তো কোনো কোনো সময় একটু বেশি হোয়ে পড়ে, কিন্তু সোজা ক'বে প্রাঞ্জল ভাষায়, পবিষ্কার সাদা কথায়, বক্তব্য বিষয় প্রকাশ ক'বতে না পাবলে কোনো বচনার অর্থ সাধাবণের বোধগম্য হওয়া কী কখনো সম্ভব? অগাধ বিদ্যাবত্তা বা দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা দিয়ে পাঠককে চমৎকৃত করা কঠিন নয়, কিন্তু তা দিয়ে অবিমিশ্র সমালোচনা-সাহিত্যেব সৃষ্টি হয় না।

ববীন্দ্রনাথেব ভাষায় যে সচ্ছন্দ গতি আছে তা সবাইর লেখাতে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু তাই ব'লে কোনো সাহিত্য-সমালোচক যদি তাঁব বচনায় কেবলই কান্ট্‌-শোওপেন্‌হাওয়াব্‌ থেকে আবম্ভ ক'বে ক্রোচে-ব্রাণ্ডেস্‌ পর্য্যন্ত গাদা-গাদা বিলিতী অভিমত উদ্ধৃত ক'রেই যান, নিজেব কী

বলবার আছে তা স্পষ্ট ক'রে না বলেন, তবে সে-রচনায় সমালোচনা-সাহিত্যের সার্থকতা থাকতে পারে না।

বহুদিন ধরে বাঙ্‌লা সমালোচনা-সাহিত্য তাই একদিকে যেমন অতিরিক্ত প্রশংসা বা অতিরিক্ত নিন্দার ভারে নিপীড়িত হোয়ে এসেচে, তেমনি তা অন্যদিকে পাণ্ডিত্য ও গুরুজ্ঞানের বোঝা টেনে আস্‌চে। সাময়িক পত্রে যে-সব সমালোচনা সচরাচর চোখে পড়ে, সেগুলি ঝাল-টক্-নূনের সংমিশ্রণে যথেষ্ট মুখরোচক হোলেও, সেগুলো আর যাই হোক্, খাঁটি সমালোচনা নয়।

আমি কোনো দলবিশেষের অন্তর্ভুক্ত নই রবীন্দ্রনাথ কী সুরেশ সমাজপতি, পণ্ডিতশ্রেণি কিম্বা অতি-আধুনিক। সাহিত্য-নীতির যেগুলো অপরিহার্য্য নিয়ম ও বিচার-ব্যবস্থা সেগুলোর ওপরেই আমি আমার রচনা দাঁড় করাতে চেষ্টা ক'রেচি। প্রবীন ও আধুনিক সাহিত্যিক কিম্বা সাহিত্য-সমালোচক কারুকেই যদি বইটা আনন্দ দিতে না পারে, তবে সেটা আমার ভাগ্যদোষ ব'লেই মনে কোরবো।

কলিকাতা
১৬ অগাষ্ট, ১৯৩৬

প্রভু গুহ-ঠাকুরতা

লেখ-সূচি

নাৎসিরা আসার আগে

নীট্‌শে এক জায়গায় বলেছেন : "জ্যর্ম্মণ্‌দের বর্ত্তমান এখনও আসে নি, তা'রা ছু'দিন আগে যা হ'য়েচে আর ছু'দিন পরে যা হ'বে তাই ভেবে ব্যাকুল।" নীট্‌শের এই কথাটার ভেতরে যে গভীর সত্য অন্তর্নিহিত আছে, তা নাৎসিরা আসার আগে জ্যর্ম্মণীর চিন্তাধারা লক্ষ্য কর্‌লে খুব সহজেই বোঝা যাবে।

ইয়োরোপের মহাসমর সাঙ্গ হওয়ার পর পরাজয়ের যে নিদারুণ ক্লেশ ও গ্লানি জ্যর্ম্মণদের ঘরে-বাইরে সইতে হয়েছিল তা থেকে আজও তা'রা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হ'তে পারে নি। হিট্‌লারের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জ্যর্ম্মণীর দার্শনিক, পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টি পড়ে' ছিল হয় অতীত গৌরব ও কীর্ত্তির দিকে, না হয় ভবিষ্যতের প্রহেলিকাময়, অজ্ঞাত কিছু-একটার দিকে।

কাইজারের বড়াইর গোড়াটা যে কত ভূয়ো, কত অপদার্থ ছিল তা' বুঝতে পেরে তারা তখন আঁৎকে উঠেছিল—আবার একেবারে আন্‌কোরা নতুন গণতন্ত্র প্রণালীটা জ্যর্ম্মণ্‌ জাতের সম্যক্‌ আত্মপ্রকাশের অনুকূল হ'বে কিনা, তা' ভেবেও তাঁদের ভয়ের অবধি ছিল না। সে-সময়কার জ্যর্ম্মণ্‌ সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন আলোচনা কর্‌লে মোটামুটি এইটুকু বোঝা

যায় যে এই চিন্তাধারার দু'টি পৃথক ও সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র দিক ছিল।

প্রথমটা অতীতের প্রতি টান, আর দ্বিতীয়টা ভবিষ্যতের কথা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। যা ছিল, যা হ'তে পারতো কিন্তু ভাগ্যদোষে হয় নি, এইটে ভেবেই জার্ম্মণীর মানুষ তখন নিরাশ হ'য়ে পড়েছিল; আর যা হয়তো কোনোদিন হ'তে পারে, সে কথা মনে করে'ও সে মাঝে মাঝে প্রাণে বল পাচ্ছিল। অতীতের জন্য বেদনা আর ভবিষ্যতের জন্য ভয়-ভাবনা এই দু'টোতে মিলে জার্ম্মণ্ চিন্তাধারা গড়ে' উঠেছিল নাৎসিদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে। তাই সাহিত্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, সে সময়টা ছিল খুবই ভরপূর। হিট্‌লার এসে অবধি কোনো সাহিত্য গড়েননি—তিনি আর যাই গড়ে থাকুন বা ভেঙে থাকুন।

প্রথমতঃ জার্ম্মণ্ চিন্তাধারার নৈরাশ্যবাদের কথা বলি। এর মন্ত্রদাতা গুরু হচ্ছেন অস্‌ওয়াল্ড্ স্পেঙ্‌লার (Oswald Spengler). স্পেঙ্‌লার নৈরাশ্যবাদকে একটা পুরোপুরি বিজ্ঞান-সম্মত দর্শনের মত খাড়া করে' তুলেছেন। *Der Untergang des Abendlandes* (The Doom of the Occident)-নামক বিরাট বইতে তিনি তাঁর গবেষণামূলক অভিমত এবং সিদ্ধান্তগুলি বিশদ্ ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বইখানা পড়্‌লেই বোঝা যায় যে স্পেঙলার্ একটু আলাদা ধরণের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। সাধারণতঃ কোনো জাতির ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং বর্ত্তমান এই তিনটি মামুলী ধরণের বিভাগে ফেলা হয়; কিন্তু স্পেঙ্‌লার ইতিহাসকে দেখেছেন দর্শনের চোখ দিয়ে। তাই তাঁর

বিচার ও আলোচনা হ'য়ে দাঁড়িয়েচে ব্যক্তিগত, জাতিগত কাল্‌চারের দিক্ থেকে।

স্পেঙ্‌লারের মতে, প্রত্যেক কাল্‌চারের একটা আত্মা অথবা প্রাণ আছে। ব্যক্তির জীবনধারার মতো সমষ্টিগত কাল্‌চারেরও শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে। কাল্‌চারের জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্য অবস্থার নাম স্পেঙ্‌লার দিয়েচেন "সভ্যতা"। তা'র অর্থ এই যে, একটা দেশ বা জাত যখনই সভ্যতার সীমায় উপস্থিত হয়, তখন তা'র জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেচে। জাতির কাল্‌চারের ভেতর যে চলৎশক্তি থাকে, তা তখন একেবারে লোপ পেয়ে যায়। তখন বিজ্ঞানের ওস্তাদী, কল-কব্জা লোহা-লক্করের মুন্সিয়ানা এসে জাতির প্রাণময় বস্তুটীকে অপহরণ করে' ফেলে। জাতির রস-পিপাসা, সত্যানুসন্ধিৎসা সব কিছুই নষ্ট হ'যে যায়।

কাজেই আজ যে পাশ্চাত্য জগৎ সভ্যতার নামে এত উন্মত্ত হ'যে নাচ্‌ছে, এটা তা'র মরণনৃত্য। স্পেঙ্‌লার্ গ্রীকো-রোমান্ কাল্‌চার্ এবং উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপের কাল্‌চার্, দু'টোকেই নেড়ে-চেড়ে দেখিয়েচেন। দু'টোরই আনুমাণিক বয়স এক হাজারের বেশী নয়। গ্রীকো-রোমান্ কাল্‌চারের বিশেষত্ব ছিল চিত্তের ধৈর্য্য ও মানসিক পরিচ্ছন্নতা ; আর ইউরোপের কাল্‌চারের বিশেষত্ব হচ্ছে চঞ্চলতা, আবেগ ও দুরাকাঙ্ক্ষা। গ্রীকো-রোমান্ কাল্‌চার্ ছিল 'প্লাস্‌টিক্', আর ইউরোপের কাল্‌চার্ হচ্ছে 'মিউজিকাল্'। প্রথমটি যখন বাঁচে নি, দ্বিতীয়টিও বাঁচ্‌বে না। কাজেই ইউরোপের অধোগমন শুরু হ'যে গেছে।

পাশ্চাত্য দেশের লোক তাদের যা কিছু সম্বল ছিল, সবই নিঃশেষে ক্ষয় করে' বসে' আছে। আর যে কয়টা দিন ইয়োরোপের আয়ু আছে সে সময়টা—যা' হয়ে গেছে আর যা' হয় নি—তা'র হিসেব-নিকেশ কর্‌তে কর্‌তেই ফুরিয়ে যাবে। তাই স্পেঙ্‌লার্‌ এক জায়গায় বল্‌চেন :

> "The ancient world died without foreboding its death. We know our history We shall die with full consciousness. We shall follow all the stages of our own dissolution with the keen eye of the experienced physician."

সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ দার্শনিক স্পেঙ্‌লারের মতবাদের ভেতরে কতখানি সত্য আছে, তা আজ আমাদের বিচার করে দেখবার সময় নেই—ইয়োরোপের কাল্‌চার্‌ বাঁচ্‌বে কী মরে' যাবে তা ভবিষ্যতের লোকেরাই ভালো বল্‌তে পার্‌বেন। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, স্পেঙ্‌লার্‌ ইয়োরোপের অধঃপতনের যে-সব লক্ষণ দেখিয়েছেন, তা দেখে তাঁর দেশবাসীদের নৈরাশ্য আরো বেড়ে গিয়েছিল। স্পেঙ্‌লারের নির্ম্মম মতবাদের প্রভাবে তারা যেন নিজেদের দুঃখ, দৈন্য ও গ্লানিকে আরো বেশী করে' হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পেরেছিল। ইয়োরোপ যদি মরে' যায়—জ্যর্ম্মণীর কী হবে? তা'র অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-শাস্ত্র, সঙ্গীত-কলা, সবই কী অতলে তলিয়ে যাবে? স্পেঙ্‌লার বিচক্ষণ হ'লেও তাঁর দৃষ্টি পড়ে' রয়েচে অতীতের দিকে, তাঁর কাছে বর্ত্তমানটার কোনো অর্থ নেই—কারণ যা'কে আজ ভুল করে' লোকে বর্ত্তমান আখ্যা দিচ্ছে সেটা তো অতীতেরই জের—আর

ভবিষ্যৎ বলে' যদি কোনো বস্তু থাকে তবে তা' স্পেঙ্‌লারের দর্শনে স্থান পায় নি। কাজেই, স্পেঙ্‌লার তাঁর দেশবাসী-দের অবশ্যম্ভাবী শেষ-সর্ব্বনাশের জন্য প্রস্তুত হ'তে আহ্বান করেছিলেন।

জ্যার্ম্মণীর এই নিরাশার ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশে দু' একটি মাত্র তারা উজ্জ্বল হ'যে জ্বল্‌ছিল। সব চেয়ে বড় তারাটি হচ্ছেন কাউন্ট্‌ কাইজারলিঙ্‌ (Count Hermann Keyserling). কাইজারলিঙ্‌ বল্‌চেন : অতীত মরে' ভূত হ'যে গেছে, তা'কে পুনরুদ্ধার কর্‌তে গেলে আত্মহত্যা করা হবে, শুধু তাকিয়ে দেখ ভবিষ্যতের দিকে—জ্যার্ম্মণীর ভাগ্য-গগনে নব-অরুণোদয়ের পূর্ব্বাভাস লেগেচে, বর্ত্তমানকেই একমাত্র খাঁটি সত্য বলে' স্বীকার কর—অতীতের ভাঙা-গড়ার মাঝখান দিয়ে আজ বর্ত্তমান তা'র নবজন্মের আনন্দকে প্রচার কর্‌চে। কাইজারলিঙ্‌ সবাইকে শুনিয়ে বল্‌চেন :

> "Perhaps never before was a people, as a thing of the past, so entirely done for as the German to-day. The heroic figures of its great tradition are gone, the representatives of its most recent past have proved incapable of satisfying the demands of a new spirit of the times But, on the other hand, never did a people in like circumstances bear so much future in itself. It is the most youthful, most virile, most promising people of all Europe"

কাইজারলিঙ্‌ বল্‌চেন, জ্যার্ম্মণীর উন্নতির দু'টি পথ রয়েচে, যা'তে করে' তা'র ভবিষ্যৎ সার্থক হ'তে পারে; রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। তিনি বল্‌চেন, নীট্‌শের শক্তিবাদ

জার্ম্মণ-ধাতে কোনোদিনও খাপ খাবে না; রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার চাইতে ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যুৎপত্তিকে জার্ম্মণরা বরাবরই অন্তরে-অন্তরে বেশি কামনা করে' এসেচে, কাজেই এখন যা'তে রাষ্ট্র ও সমাজ সুন্দর, সবল, প্রাণবান হয় সেদিকেই লক্ষ্য দিতে হ'বে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও জার্ম্মণকে ঔদ্ধত্য ও বড়াই পরিত্যাগ করতে হবে। তা না হ'লে জার্ম্মণীতে নতুন রাষ্ট্র, নতুন সমাজ কিছুতেই গড়ে' উঠবে না। সেজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধের পরিচালনা করতে হ'বে। পরাজিত, লাঞ্ছিত ও গরীব হ'লেও জার্ম্মণীকে কেবল ন্যায, সাম্য ও সৌন্দর্য্যবোধ দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজকে নূতন ছাঁচে তৈরী করতে হ'বে। তা'তে যদি সাফল্য লাভ হয তবে

> "the growth of a new national type which will unite the best tradition of the past with the stern realities of the present seems in the long run assured"

কাইজারলিঙের *Das Reisetagebuch eines Philsophen* (The Travel Diary of a Philosopher) বের হওযার পর থেকে তাঁর নাম দেশে ও বিদেশে সুপরিচিত হযেচে। কাইজারলিঙের জন্ম জার্ম্মণীতে নয, এস্থোনিযাতে। অবিশ্যি তিনি এক অতি প্রাচীন এবং নামকরা জার্ম্মণ বংশেরই সন্তান। যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েট্ রাশ্যার হাতে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে "আত্মানং বিদ্ধি" এই মন্ত্র নিযে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিযেছিলেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের ঐতিহাসিক পর্য্যালোচনা করার ছলে তিনি তাঁর আত্মচিন্তা এই বইটার ভেতরে বিস্তৃত করে' নিবদ্ধ করেচেন।

শাস্ত্রজ্ঞ ও চিন্তাশীল এই জ্যর্ম্মণ দার্শনিকের সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সুমুখে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও রস-সাহিত্যের নিগূঢ় সত্য-গুলি সহজেই ধরা পড়ে' গেছে। তিনি যে খুব খোলা ও উদার মন নিয়ে বিচার করেচেন একথা না মেনে উপায় নেই। যেখানে যা কিছু সুন্দর, গভীর ও তথ্যমূলক দেখেচেন ও শুনেচেন, তা সবই তাঁর বইতে লিপিবদ্ধ করেচেন। এক হিসেবে এই বইটাকে কাইজারলিঙের "আত্ম-স্মৃতি" কিংবা ঐ ধরণের কোনো একটা নামে অভিহিত করা চলে। কেননা, তাঁর নিজের অন্তর-লোকের গভীর চিন্তার ক্রম-বিকাশ এবং পরিণতি এই বইটাতে রয়েচে। তাঁর ভেতরকার আসল সত্বাটি তিনি অতি প্রাঞ্জল ক'রে পাঠকের কাছে ব্যক্ত করেচেন। বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, কন্‌ফ্যুসিয়াসের ধর্ম্ম—সবগুলিরই মর্ম্মকথা তিনি বুঝতে চেষ্টা করেচেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম্মনীতি এই দু'টোরই ভালমন্দ তিনি দেখিয়েচেন। এতে কাইজারলিঙের মনের উদারতা ও সার্ব্বজনীনতা স্পষ্টই বোঝা যায়।

বিশেষ ক'রে হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা ও বিশালতা তাঁকে আকৃষ্ট করেচে। ভারতবর্ষে ব্যক্তির চরম আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির আদর্শকে (perfection) তিনি ইয়োরোপে ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক চরম উন্নতি (progress)-র সঙ্গে তুলনা করেচেন। কাইজারলিঙের মতে হিন্দুদের perfection-এর আদর্শ মানব-মনের পরিপূর্ণ ব্যুৎপত্তির লক্ষণ। হিন্দুস্থানের মানুষ তা'র আপনার সত্যস্বরূপকে জান্‌তে চায়—জান্‌বার জন্য আপনাকে ধ্যান-ধারণায় নিয়োগ করে—সে "হ'তে" চায়; আর ইয়োরোপের মানুষ কেবল

"কর্‌তে" চায়, "পেতে" চায়। এই "হওয়া" আর "কবা"ব ভেতরেই রয়েচে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যেব মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মস্ত বড় প্রভেদ।

আত্মজ্ঞান বড কী আত্মনিয়োগ বড়, তা'র কোনো মীমাংসা অবিশ্যি কাইজার্‌লিঙ্‌ করেন নি। তবে আত্মজ্ঞান দিয়ে যে মানুষেব চবম ও পবম শান্তি হয় এবং আত্ম-ব্যবহাব দিযে যে তা'র আর্থিক, মানসিক এবং সাংসাবিক আরাম ও উন্নতি লাভ হয—সে কথা তিনি স্পষ্ট করেই বলেচেন তাঁব সব কথাব শেষ কথাটি এই—

> "It is the mission of the West to put into practice what the East, especially India, has first understood as a theoretical command"

দুনিযার সমস্ত দেশ ও জাতিব ভেতবে ধর্ম্মগত ও কালচাব্‌গত সাম্য ও মৈত্রী স্থাপন, পরশ্রীকাতবতা ও গৃধ্নুতাকে অতিক্রম কবে' সমষ্টির কল্যাণ সাধন—যা'কে ইংবেজীতে "world consciousness" বলে—এই আদর্শকেই কাইজার্‌লিঙ্‌ জ্যর্ম্মণ চিন্তাধাবার ভেতরে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে প্রযাস কবেচেন। তাঁর দেশবাসীবা তাঁর আশাব বাণী, মহামানবের কল্যাণেব বাণী শুন্‌চে কিনা তা তা'বাই জানে। শুনে' থাক্‌লেও প্রশ্ন উঠ্‌বে এই যে, চিন্তাব বাজ্যে এই আশা-আশ্বাসেব কথা খানিক পরিমাণে ফলপ্রসূ হ'লেও, সাহিত্য ও বস-শিল্পেব রাজ্যে তা কোনো প্রভাব বিস্তাব কব্‌তে পেবেছে কী?

বর্ত্তমান সমযে এই প্রশ্নেব জবাব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কেননা যুদ্ধ হ'য়ে যাওযাব পরেব যুগে জ্যর্ম্মণ সাহিত্য, সঙ্গীত,

শিল্পকলা সবই এত এলোমেলো যে কোনো সূক্ষ্ম বিচাব করা অসম্ভব। দেশটার ওপব দিয়ে নানা প্রকারেব হাওযা বয়ে' গেছে—সবগুলিই অশান্ত ও চঞ্চল। সাহিত্যিকদের মেজাজ-মর্জ্জির কোনো তাল পাওযা শক্ত। এ অবস্থাটা একটুও অদ্ভুত নয। কাবণ, ইযোবোপেব অন্যান্য দেশের মত জার্ম্মণীতেও যুদ্ধাবসানেব পব থেকে জীবনের ওপর অবিশ্বাস, সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা ও দুনিযাব প্রতি দাকণ অশ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব আদর্শই ভেঙে খান্‌-খান্‌ হ'যে গেছে—মানুষেব পাশবিক রূপ মহাসমবের শ্মশানের ওপব তাণ্ডব নৃত্য কব্‌চে। এই কথাটা মনে থাক্‌লে ভেবে অবাক হওযাব কিছুই নেই যে, জার্ম্মণীব আধুনিক সাহিত্যেই হোক্‌ কিংবা শিল্পেই হোক্‌, ভযানক বিকৃতি ও অসংযম ঘটেচে।

মানব-মনেব কুশ্রীতা আজ যে কত নগ্নভাবে জেগে উঠেচে তা এ-যুগেব জার্ম্মণ্‌ সাহিত্য ও শিল্পের দু'চাবটা নমুনা দেখ্‌লেই বোঝা যায। ধবা যাক্—Ernst Toller-এর বিখ্যাত নাটক, *Masse Mensch* (Man in the Mass). তথাকথিত সভ্য এবং ধনলোভী ইযোবোপেব এমন সুস্পষ্ট অথচ কুশ্রী ছবি এ-যুগে আব কোনো বইতেই বোধ হয এমন নগ্ন ভাবে দেখানো হয নি। বাষ্ট্রনীতিব অছিলায় জুযাচুরী, প্রচলিত অর্থনীতিব ছলনায মিথ্যাবাদ, আব সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও ধনিকেব ভেতবে মরণ-সংগ্রাম এবং আনুসঙ্গিক নিষ্ঠুবতা, প্রতিহিংসা-পবাযণতা—এর প্রত্যেকটাবই নিখুঁত ছবি এই বইটাতে বযেচে।

Jacob Wassermann তাঁব "Lost Years" নামক

উপন্যাসে বর্ত্তমান ইযোরোপেব ব্যাধি ও আধি অতি নির্ম্মম ভাবে বিশ্লেষণ কবে' দেখিয়েছেন। Franz Werfel-এর *Der Gerichstag* (Doomsday) আগাগোড়াই মানুষের অন্ধকাবে একা-একা পথ-চলাব কাহিনী। এই তো গেল সাহিত্য।

তারপর আধুনিক জার্ম্মণ্ শিল্পের নিদর্শনগুলিও তদ্রূপ। Otto Dix-এব "War" নামক চিত্র, কিংবা Franz Mare-এব "Tower of Blue Horses" অথবা Waner-এব "Man's Impotent Reaching into the Universe"—এব প্রত্যেকটাই জার্ম্মণীব বসবোধেব বিকৃতি এবং ক্লৈব্য প্রকাশ কবছে। কাজেই সত্যিকাবেব সাহিত্য বা শিল্প—রসালো ও জোবালো বসসৃষ্টি—বর্ত্তমান যুগেব জার্ম্মণীতে তৈবী হযেছে ব'লে মনে হয না। নিরাশ হওযাব কিছুই কাবণ নেই হযতো. কেননা দু'-একজন লেখক নিজেকে খানিকটা সাম্‌লিযে নিযে চলেছেন, এবং উঁচুদরেব বসসৃষ্টিব দিকেও লক্ষ্য বেখেচেন। এঁদেব মধ্যে Thomas Mann-এব নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯০১ সালে যখন টমাস্ মান্-এব প্রথম উপন্যাস *Die Buddenbrooks* বেবোয তখন থেকেই এই নূতন লেখকেব দিকে সকলেব নজব পড়ে। মান্-এব সেই সমযকাব লেখার ভিতবেই একটা স্পষ্ট, অথচ তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি দেখা গিযেছিল। যুদ্ধেব সমযে মান্ আপনাকে একেবারে আলাদা রেখেছিলেন; সেই উৎকট কলবোলেব সমযে তিনি একদিনেব জন্যও মুখ ফুটে' কথা বলেন নি। পড়া-শুনা নিযেই আত্মহাবা হ'যে ছিলেন। সন্ধি-স্থাপনেব সাত বছর পবে বহু

পরিশ্রমেব ফলস্বরূপ মান্ তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস *Der Zauberberg* (The Magic Mountain) প্রকাশ কব্‌লেন।

এই সুবৃহৎ উপন্যাসেব সমস্ত ঘটনা বিবৃত কবা কিংবা সমস্ত চবিত্রগুলিব বিশ্লেষণ কবা এ স্থানে অসম্ভব। মোটামুটি গল্পটা এই : এক অ্যাল্পাইন্ পাহাডেব ওপবে একটি বৃহৎ যক্ষ্মাবোগীর স্যানিটেরিযাম্, খুব পবিপাটি ও নিপুণ কবে' তা'র ঘব-দুযার সাজানো, মানুষেব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেব যত প্রকাব প্রযোজনীয ও অপ্রযোজনীয জিনিষেব দব্‌কাব তা সেখানে রযেচে, প্রত্যেক বোগীব মুখে মৃত্যুব ছাযা পড়েচে; তা'রা সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিগ্রস্ত হ'যেও মবণকে ভুলে' গিযে দু'দিনেব খেলা-ধূলোয মজে' বযেচে, বোগেব দরুণ তা'দেব উপভোগ কব্‌বাব পিপাসা যেন আবো বেডে উঠেচে। কেবল Joachim Ziemssen নামক একটি যুবক জ্যর্ম্মণ সৈনিক ব্যাধিকে অতিক্রম কব্‌বাব জন্য দুঃসাধ্য চেষ্টা কব্‌চে—কিন্তু সবাই নয। Signor Settembrini একজন ইতালিযান্ দার্শনিক ও বসিক আব সবাইব মতো নিজে বোগী হ'লেও স্যানিটেবিযামেব এই জীবন-পিপাসাকে বিদ্রূপ কব্‌চে। মৃত্যুকে কী কবে' জয কব্‌তে হয, তা'ব ওপব সে মস্ত মস্ত বক্তৃতা দিচ্ছে। হল্যাণ্ড্‌বাসী এক তামাকেব ব্যাপারী Peeperkorn ইতালিযান্ সেত্তেম্ব্রিনির বাখানিব ওপর বসে' বসে' টিপ্পনী কাট্‌চে।

সবাই মৃত্যুপথেব যাত্রী—কিন্তু এদেব কারুব সঙ্গে কারুব যোগাযোগ নেই। এদেব সবাইব মাঝখানে নির্ব্বাক, নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট হ'যে পডে' বয়েচে উপন্যাসেব

নায়ক—Hans Castorp. সে কিছু দেখেও দেখচে না—শুনে'ও শুনচে না যেন। মাসের পর মাস চলে' যাচ্চে—কিন্তু ভাবচে আর ভাবচে—মানুষের জীবনটা কী? মৃত্যুটাই বা কী? যে ব্যাধিতে তা'কে ধরেচে, তা তো বর্ত্তমান ইয়োরোপীয়ান্ সভ্যতারই দুরারোগ্য, কঠিন ব্যাধির প্রতীক। জীবনের সুমুখের দিকে যে অনন্ত মহান্ ভবিষ্যৎ পড়ে' আছে, তা'র কথা কী মানুষ ভাববে না? এই সব কথাই ভাবচে কাস্তর্প। স্যানিটেরিয়ামে এসে অবধি সে একটি তরুণীকে খুব লক্ষ্য করেচে—র‍্যাশ্যান্, নাম Madame Chauchat—খুব ভাল লেগেচে দেখে অবধি। তা'র মুখচ্ছবিতে কাস্তর্প তা'র অনন্ত অসীম জীবনের একটা জাগ্রত রূপ দেখ্‌তে পাচ্চে। তবুও সে সাহস করে' তরুণীটির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারচে না। অথচ মাদাম্ শোশার চোখের দৃষ্টি যেন কাস্তর্পকে অহর্নিশ খুঁজে' বেড়াচ্ছে। কাস্তর্প, মনকে ভুলিয়ে রাখে এই ভেবে যে, এ-আকর্ষণও তো একটা কঠিন ব্যাধি; প্রেম আর ব্যাধি এ দু'টোতে তো কোনোই তফাৎ নেই, দু'টোই দেহ ও মনকে নিঃশেষে ক্ষয় করে' ফেলে; দু'টোই তো মানুষকে মরণের পথে এগিয়ে দেয়। চার দিকে তাকিয়ে দেখে, আর ভাবে যে, এই "মায়ার পাহাড়" আজ সবাইকে একসঙ্গে মরণের কোলে ডেকে এনেচে।

সমস্ত উপন্যাসটার ভেতর মাত্র দু'বার কাস্তর্পের সঙ্গে মাদাম্ শোশা'র দেখা। কোনোবারই দু'জনে বেশি কথা বলে নি। তবুও চোখের চাউনি দিয়ে একজন আর একজনের মনকে বুঝে' নিয়েচে। তা'দের গোপন প্রেম মৃত্যুকে জয় করবে, এ তা'রা নীরবে বুঝে' নিয়েচে। অবশেষে

কাস্তর্প নিজের অস্তিত্বকে একেবারেই হারিয়ে ফেললে—লেখকের ভাষায় বলতে গেলে, তা'কে 'great dullness"-এ ধরলে। এমনি অবস্থায় একদিন নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করে' এক বজ্রনিনাদ তা'র কানে এসে পৌঁছল—মহাসমরের ডাক। গ্রন্থকার লিখছেন :

> "The dreamer stood up, looked about himself. He felt disenchanted, redeemed, delivered, not through his own will-power but hurled into space by elemental forces to which his deliverance was an entirely accidental matter."

মুক্তির ডাক শুনে' কাস্তর্প যুদ্ধক্ষেত্রে এসে নেবে পড়লো—জীবনের অন্ধকারকে বারুদের ভস্মরেখার সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে সে মরণের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিলো।

কাস্তর্পের মতোই কী এ-যুগের জ্যর্ম্মণী নৈরাশ্য ও অবিশ্বাসের অন্ধকারের হাত থেকে মুক্তি পাবে? স্পেঙলার্ বলচেন—কিছুতেই পাবে না। কাইজার্লিঙ্ আশ্বাসের সুরে বলচেন— পাবে, পাবে, নিশ্চয়ই পাবে।

একবার ঝড় উঠেছিল—সে ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটা যে জ্যর্ম্মণীর চূড়ান্ত সর্ব্বনাশই করে' গেছে, এ-কথা আমাদের মনও কিছুতেই মানতে চাইছে না।

আবার আর একটা ঝড় উঠেছে—নাৎসিদের ঝড়—সেটাও বুঝিবা আর একটা সর্ব্বনাশের পূর্ব্বরাগ।

বল্‌শী এল দেশে

প্রায কুড়ি বছর হ'তে চল্‌লো রাশ্যাতে একটা অভিনব ও বিপুল বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল। বিপ্লবের নাম যে বল্‌শেহ্বিজ্‌ম্‌, তা' সবাই শুনেচেন, কিন্তু এ-বিপ্লবের প্রকৃত স্বরূপ বা অর্থ কী, এবং তা'র বিস্তৃতি ও প্রভাবই বা কত-খানি হয়েচে, তা আজ পর্য্যন্ত খুব কম লোকই সঠিকরূপে নির্ণয করতে পেরেচেন। রাষ্ট্রীয, আর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে বল্‌শেহ্বিজ্‌ম্‌ রাশ্যাতে কী কী অভাবনীয পরিবর্ত্তন এনেচে, তার খবর কিছু কিছু সবাই আমরা পেয়েছি; কিন্তু রাশ্যার সাহিত্য ও আর্টের ওপর এ-বিপ্লবের প্রভাব গোড়ার দিকে কতখানি এবং কিরূপে পড়েচে তার খবর আজ পর্য্যন্ত আমাদের জান্‌বার বেশী সুযোগ হয নি।

রাশ্যাতে বল্‌শেহ্বিক্‌-বাদের ফলে রস-সাহিত্যের উন্নতি হয়েচে কী অবনতি হয়েচে, সেটা এখনও কারুর বলবার জো নেই। কারণ, প্রপাগ্যাণ্ডিষ্ট্‌ সাহিত্যের জের রাশ্যায আজও চল্‌ছে, সাহিত্য এখনও বল্‌শেহ্বিক্‌-বাদের বাহন রূপেই তার কাজ করে যাচ্ছে।

জারের অত্যাচারী শাসনকে উচ্ছিন্ন করে আজ শ্রমজীবি-সঙ্ঘ রাশ্যাতে যে-রাষ্ট্রতন্ত্র স্থাপন করেচে, তার ভেতরে সত্যিকারের সাহিত্য-সৃষ্টির খোরাক অন্ততঃ প্রথম দিকটায খুবই কম ছিল—বল্‌শেহ্বিষ্টদের প্রথম লক্ষ্য ছিল কী করে জারের নির্ম্মম একাধিপত্যের বদলে প্রোলিটারিয়েটের কর্ত্তৃত্ব, অর্থাৎ চাষী ও শ্রমিকের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করা যায

গোড়া থেকেই বল্‌শেভিজ্‌ম্ এর মূলমন্ত্র হচ্চে জাতে-জাতে লড়াই : এক কথায়, ধনী, অভিজাত সম্প্রদায়, মহাজন, বণিক এদের বিরুদ্ধে শ্রমিকের সংগ্রাম। পয়সায় ও আভিজাত্যে বড়-ছোটর মধ্যে এই মারামারি কাটাকাটি জিনিসটা সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে অকল্যাণকর বলেই মনে হবে। শ্রমিক ও ধনীর ভেতরে সংঘর্ষ—এই ব্যাপারটা যদি শুধু রাষ্ট্রনীতিতেই আবদ্ধ থাক্‌তো তা হ'লেও বরঞ্চ এক রকম চল্‌তো, কিন্তু একে প্রথম থেকেই বল্‌শেভিস্‌টরা সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-প্রচারের একমাত্র মানদণ্ড বলে' ধরে' নিয়েচেন। তা'র ফলে, রাশ্যাতে আজ পর্য্যন্ত কেবল একটানা, নির্জ্জলা শ্রমজীবি-সাহিত্যই গড়ে' তোল্‌বার চেষ্টা চল্‌ছে।

পুশকিন্, টল্‌স্‌টয়, দস্তয়্‌এভ্‌স্কি, আভিজাত্যবাদী লেখক বলে' বর্ত্তমান যুগে রাশ্যার কাউকে এখন আর তাঁদের লেখা পড়্‌তে দেওয়া হয় না। এ তো আমি কয়েক বছর আগে নিজের চোখেই দেখে এসেচি। স্কুল-কলেজে বা শহরের লাইব্রেরীতে প্রাচীন অথবা বর্ত্তমান যে-সব সাহিত্য-শিল্পীদের বইতে আভিজাত্যবাদের সামান্য একটু গন্ধ আছে, সেগুলি আর রাখা হয় না। আমরা এদেশে ঘরে বসে' চেখভ্‌, তুর্গোনিয়েভ্‌ বা গর্কীর বই পড়্‌চি, কিন্তু রাশ্যাতে এদের কারুর বই বাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেলে তা'র প্রাণ নিয়ে টানাটানি লাগে।

যাঁরা বলশেভিজ্‌ম্-এর সাহিত্যিক দৌরাত্ম্যের কথা জানেন না, তাঁরা হয়তো সহজে এ-কথাটা বিশ্বাস কর্‌তে চাইবেন না। গোড়া থেকেই রাশ্যার নতুন প্রভুরা বলে'

আস্‌চেন : “আমবা কেবল চাই অ্যাজিটেইশন্‌-সাহিত্য, উত্তেজনা-মূলক সাহিত্য। আমাদের রস-সাহিত্য দিয়ে কী হ’বে? সাহিত্যেব একমাত্র রস যোগাবে আমাদের আভি-জাত্য-বিনাশক অভিযান। কৃষী-মজুবই হচ্চে আমাদের প্রাণ, তা’ব আত্মপ্রতিষ্ঠাব সংগ্রামই হ’বে আমাদেব নতুন শূদ্র-সাহিত্যেব একমাত্র খোরাক। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, রসানুভূতি, বসসৃষ্টি ও সব হ’চ্চে বড লোকেব সাহিত্যেব গাঁজাখুবী গল্প। আমাদেব সাহিত্য হবে একেবাবে খাঁটি মাটিজ।” সুতবাং ও ক’ বছব ধরে’ সাহিত্য, নাটক, শিল্প, রাশ্যাব সব বসসৃষ্টিই হযেছে নির্য্যাতিত গরীবেব অভিজাত-সম্প্রদাযেব প্রতি রাগ, বিদ্বেষ, কোঁদল, গালাগালি ও জিঘাংসাব ছবি।

দেমিযান্‌ বেদ্‌নী সোভিযেট্‌ রাশ্যাব একজন বিখ্যাত কমিউনিস্‌ট্‌ কবি ও সাহিত্যিক। তিনি মস্কোতে কযেক বছব আগে একটা সাহিত্য-পবিষদেব সভায বলেছিলেন :

> ‘Proletarian poets exist. They may not be of the first rank; but that is no misfortune for the moment. Let them be crude and unpolished as long as they are our own men.’

অর্থাৎ, ‘খাঁটি প্রোলিটাবিযান্‌ কবিবা আজ বিদ্যমান; তা’বা অতি উঁচু দবেব না হ’তে পাবেন, কিন্তু তা’র জন্য দুঃখ কব্‌বাব কিছু নেই। যতক্ষণ তা’বা আমাদের নিজদের লোক, অর্থাৎ কমিউনিস্‌ট্‌, ততক্ষণ হোক্‌ তা’রা যত খুসী অসংস্কৃত ও অমার্জ্জিত, তা’তে কিছু এসে যায় না’

বাশ্যাব বিখ্যাত দার্শনিক ও শবীববিজ্ঞানবিদ্‌ পাভ্‌লোভ একবাব বুখাবিন্‌কে জিজ্ঞেস করেছিলেন :

'How can you be leaders in culture, when you yourself admit that the working classes are utterly uncultured ?'

তার মানে, 'তোমরা যখন নিজেরাই স্বীকার করছো যে শ্রমিকদের ভেতরে কাল্চার একবারেই নেই, তখন কী ক'রে তোমরা একটা বিশিষ্ট কোনো বল্‌শেভিস্ট্ কাল্চারের সৃষ্টি করবে' ?

এর উত্তরে বুখারিন্ বলেছিলেন :

'You are right. We know we are uncultured Nevertheless, a man may lack culture and yet have the right political convictions'.

সোজা কথায়, 'আপনি যা বল্‌ছেন তা' মেনে নিলুম। জানি আমাদের কাল্চার নেই। তা হোক্—কাল্চার না থাক্‌লেই কী কারুর নিজের দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার উপর সত্য বিশ্বাস থাক্‌তে পারে না' ?

এ সব কথার স্পষ্ট অর্থ হচ্চে এই যে, বল্‌শেভিস্ট্ সাহিত্যে ভাষা, ভাব ও গঠনের সৌষ্ঠব না থাক্‌লেও চলবে যদি তা'তে থাকে কমিউনিস্‌টিক্ মতবাদের পরিপোষণ, অনুশীলন ও অনুমোদন এবং অভিজাত কাল্চারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিষোদ্গীরণ। সত্যি ভাব্‌লে দুঃখ হয় যে, বল্‌শেভিস্ট্ যুগের আগে যে-রাশ্যাতে এতগুলি প্রতিভাশালী, পরিকর্ম্মীকৃত সাহিত্য-শিল্পী জন্মেছিলেন, সে-দেশের সাহিত্যকে আজ একটা অশিক্ষিত, ক্ষমতাগর্ব্বী দলের সৃষ্টিছাড়া সাহিত্যিক পাগ্‌লামির হাতে এমন অপমান ও লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে।

রাশ্যার সাহিত্য এই ভাবে বল্‌শেভিস্‌ট্‌ গোঁড়ামি ও অজ্ঞতার শেকলে বাঁধা পড়ে' থাকবে—তা'র হাত-পা-মুখ বন্ধ, নড়্‌বার শক্তি থাকবে না—তা'র স্বাধীন আত্মপ্রকাশের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে—একথা ভাব্‌তেই অসহ্য লাগে। কঠোর ও নির্ম্মম নীতি দিয়ে হয়তো কিছুকালের জন্য একটা রাষ্ট্রতন্ত্র রক্ষা করা চলে, কিন্তু সাহিত্য জিনিষটা যেহেতু মানব মনের স্বচ্ছন্দ, সাবলীল রসধারা, সেহেতু সেটা কোনো জুলুম ও জবরদস্তি নিয়ে রক্ষণ ও বর্দ্ধন করা চলতে পারে না। তাই, বল্‌শী যখন রাশ্যায় প্রথম এল তখন যে-সাহিত্য সে গড়্‌বার চেষ্টা করলো তা হয়ে উঠ্‌লো একেবারে খোঁড়া সাহিত্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯২৩ সালে ভেরাসায়েভ্‌ (Verasaev) *In a Blind Alley* (চোরা গলি) নামে যে উপন্যাসখানা লিখেছিলেন, তা হোলো বল্‌শেভিস্‌ট্‌ সাহিত্যের জড়তা ও নির্ব্বুদ্ধিতারই একটা নিখুঁত হুবহু প্রতিকৃতি।

যা'কে আমরা খাঁটি সাহিত্য ব'লে জানি তার কী কোনো মার্কা আছে? তা সম্ভ্রান্ত সাহিত্য-ও নয়, শূদ্র-সাহিত্য-ও নয়। সাহিত্যিক ও রস-সন্ধানীদের কাছে এ সব প্রভেদের কোনো মূল্য নেই।

মানুষের জীবন-নাট্যের অভিনয় হচ্চে এই রূপরস-গন্ধস্পর্শশব্দময়ী ধরণীর বুকে। দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে, জয়-পরাজয়ের মাঝখান দিয়ে সে চলেচে। তারই জীবন-যাত্রার কাহিনী হচ্চে সব সাহিত্যের উপাদান। সাহিত্য কোনো এক বিশেষ মানব-শ্রেণীর একচেটিয়া হ'তে পারে না; তা'র মালমস্‌লা সংগ্রহ হয় না একটা কোনো

নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ, গণ্ডীব জীবন-প্রবাহ থেকে। ত্রৎস্কি তাঁর *Revolution and Literature* (বিপ্লব ও সাহিত্য) বইখানিতে এই কথাটির একটু একটু আভাষ দিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি বল্‌ছেন :

> 'A dictatorship of the proletariat is merely a transitional phase, through which humanity is to reach a class-less society and a class-less art The task of to-day is for the proletariat to assimilate the best of bourgeois culture.'

অর্থাৎ, 'এই যে শ্রমিকেব একাধিপত্য, তা বরাবর থাক্‌বে না, কিন্তু এব ভেতব দিয়েই মানুষকে একটা সার্ব্বজনীন সমাজ ও আর্ট গড়্‌তে হ'বে। আজ্‌কেব দিনে শ্রমজীবিদের সব চেয়ে বড কাজ হচ্ছে অভিজাত কাল্‌-চাবেব ভেতব যা কিছু সব চেয়ে ভালো, তা আপ্‌নার কবে' নেওয়া।'

ত্রৎস্কিব এই উক্তি শুনে' হযতো অনেকে খুব বিস্মিত হবেন, কিন্তু লেনিনেব মৃত্যুব কিছুদিন আগ থেকেই ত্রৎস্কির চিন্তাবাজ্যে ও কর্ম্ম-প্রণালীতে একটা অভাবনীয পবিবর্ত্তন এসেছিল। এইজন্য অনেক দিন থেকেই ত্রৎস্কি বর্ত্তমান বল্‌শেভিক্‌ পাণ্ডাদেব বডই অপ্রীতিভাজন হ'যে পডেছিলেন। এবং আজ ত্রৎস্কি পদচ্যুত ও দেশ থেকে বিতাডিত হ'যে প্রবাসে কাল যাপন কব্‌ছেন। ত্রৎস্কি ছাডাও আবো দু'-একটি লেখক মাঝে মাঝে এ সব কথা সাহস করে' লিখেছেন। "Krasanaia Nov" পত্রিকার সম্পাদক ভোবোন্‌স্কি (Voronskii) একবাব লিখেছিলেন:—

'In the transition period of the dictatorship of the proletariat we can have no proletarian art. The task of this epoch in the field of culture is for the proletariat to master the technology, the science and the art of the preceding centuries.'

অর্থাৎ, 'শ্রমিক-রাজত্বের এই অনিশ্চিত অবস্থায় আমাদের একটা বিশিষ্ট শ্রমজীবি আর্ট্ থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। সত্যিকার কাল্‌চারের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হ'লে এ-যুগের শ্রমজীবিদের আজ গত শতাব্দীর বিদ্যা-কৌশল, বিজ্ঞান ও আর্টকে প্রথমে আয়ত্ত করতে হ'বে।'

কিন্তু তখনকার দিনে এ-সব কথা অরণ্যে রোদনের মতো নিষ্ফল হ'য়েছে। বল্‌শেভিজম্-এর অর্থহীন অসংখ্য বিধি-নিষেধের অত্যাচারে এবং প্রেস্-শাসনের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে রাশ্যাতে সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক গতি প্রতিনিয়ত প্রতিহত হ'য়েই চলেচে। নূতন আশা, উদ্যম ও উৎসাহের বন্যা নিয়ে যে-বিপ্লব এসে বিপুল রাশ্যান্ সাম্রাজ্যকে প্লাবিত করেছিলো, তা'র ভেতরে ছিল কেবল একটা দুর্নিবার অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা। সাম্রাজ্য ভেসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও ভেসে যেতে বস্‌লো। যারা নতুন সাহিত্য গড়্‌বে বলে' ভেবেছিল, তাদের সেই অদূরদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতার জন্য এখনও তা গড়ে' উঠ্‌চে না। যে-সব মনীষীরা সাহিত্যে সংযম ও সৌন্দর্য্যের নামে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন তাদের কারুর বা মৃত্যু হ'ল, কারুর বা নির্ব্বাসন।

দুনিয়ার সব দেশের সাহিত্যে একটা সর্ব্ববাদিসম্মত মাপকাঠি আছে; সেটা কেবল খামখেয়ালী দিয়েই সৃষ্টি হয়নি।

বহুযুগের সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফলে সাহিত্য-বিচারের আইন-কানুন তৈরী হয়েচে। যখন কোনো দেশে ওগুলি বিকল বা অচল হ'য়ে যায়, তা'র সাহিত্যও পঙ্গু হ'য়ে পড়ে। সাহিত্যে আলস্য ও আবর্জ্জনা দূর কর্‌বার জন্য মাঝে মাঝে বিপ্লবের দরকার হয় অবিশ্যি; কিন্তু সে বিপ্লবের ভেতরে সৃষ্টির অনুপ্রেরণা না থাক্‌লে তাতে অনিষ্টই হয়। আগুনের স্বভাব কেবল দাহ করা নয়—ময়লা পু'ড়ে খাক্ করা। অন্ধ গোঁড়ামি ও খাম্‌খেয়ালীর আঘাত খেয়ে খেয়ে বলশেভিক্ যুগের আধুনিক সাহিত্য যে আজও নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট, ও অসাড় হ'য়ে পড়ে আছে, এ কথা না মেনে উপায় নেই।

বল্‌শেভিসট্ সাহিত্যে গোঁড়ামি সম্বন্ধে আর দু-একটি কথা বল্‌বো। "Krasanaia Nov" কাগজে কিছুদিন আগে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, তাতে বল্‌শেভিসট্ সাহিত্যের দুর্দ্দশার কথা পড়েছিলুম; এখানে সে প্রবন্ধ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে' দিচ্চি:

> 'The first quality demanded of literature today in Russia is that it is easily understood by the masses. Anything artistic, elaborate, subtle, cleverly conceived is rejected as 'over the heads of the masses.' So we must confine ourselves to the masses. If I were to write 'I' instead of 'we' in a poem, I should have the authorities on my back in a moment with charges of 'individualism', 'mysticism', 'counter-revolution'. If I were to use the figure 'snow-carpet' in describing a winter scene some fiery champion of the pro-

letariat would protest : No peasant or labourer would use the word 'carpet' At most, he would say, 'mat'. If a poet speaks of 'sauntering through the market,' he is accused of 'encouraging idleness' and undermining the *morale* of the worker.'

[আধুনিক রাশ্যান্ সাহিত্য যদি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য হয়, তা হলেই তা সাহিত্য হ'ল। যা কিছু সৌষ্ঠবসম্পন্ন, বিশদ, সূক্ষ্ম, এবং যা'তে পরিকল্পনার চাতুর্য্য আছে, তা জনসাধারণের বিরোধী ব'লে প্রত্যাখ্যাত হবে। তাই আমাদের কেবল সাধারণ লোকের জন্যই সাহিত্য রচনা করতে হবে। যদি কোনো কবিতায় কেউ 'আমরা' না লিখে 'আমি' লেখে, তা হ'লে সে স্বতন্ত্রবাদী, মিস্টিক্, বিপ্লববিরোধী বলে' কর্তৃপক্ষ দ্বারা লাঞ্ছিত হবে। আবার যদি কেউ শীতকালের কোনো দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে 'তুষার'কে 'গালিচা'র সঙ্গে তুলনা করে তা হ'লে কোনো শ্রমতন্ত্রবাদী হয়তো গরম হ'য়ে প্রতিবাদ করবে "কোনো চাষা বা মজুর কস্মিন্‌কালেও 'গালিচা' কথাটা ব্যবহার করবে না ; বড জোর বলবে, 'মাদুর'।" যদি কোনো কবি কারো কথা বলতে গিয়ে লেখেন "সে বাজারে ঘুরে' বেড়াচ্ছে" তখনই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হ'বে যে তিনি "অলসতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন" আর শ্রমজীবিদের মনের জোর নষ্ট ক'রে ফেলছেন।]

রাশ্যার শিক্ষা-বিভাগের বড়কর্ত্তা হচ্ছেন লুনাচার্‌স্কি। প্রতিভাশালী লেখক ও নাট্যকার বলে' ইউরোপে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। যদিও তিনি নব্য রাশ্যায় শিক্ষার প্রসার, সাহিত্যের বিস্তার ও আর্টের উন্নতিকল্পে অনেক করেছেন, তবু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনিই স্বাধীন সাহিত্য-রচনা এবং স্বাধীন মত প্রকাশে বরাবর বাধা দিয়ে আস্‌ছেন। সেন্‌সর্‌সিপের সমর্থনে তিনি একবার এই কথা বলেছিলেন :

'You complain of censorship The censorship is an impediment only for you, counter-revolutionists ! Our censorship merely forbids you to circulate in a literary form what might poison the people with anti-Bolshevik ideas'.

[সেন্‌সর্‌সিপ্ ভালো নয় ব'লে আপনারা অভিযোগ করছেন। কিন্তু সেটা কেবল তাদের পক্ষেই খারাপ, যারা বিপ্লব-বিরোধী। সাহিত্যের ভেতর দিয়ে যা'তে আপনারা বল্‌শেভিক্ চিন্তাধারার প্রতিকূলতা করে লোকদের মন বিষাক্ত করতে না পারেন, শুধু এইজন্যই আমরা এই প্রেস-শাসন প্রবর্ত্তন করেছি।]

কাজে-কাজেই বল্‌শেভিস্‌ট্ সাহিত্যের পাণ্ডাদের এরূপ গোঁড়ামির জন্য আজ যে-সাহিত্যে সোভিয়েৎ-তন্ত্রের শাসনের সমালোচনা থাকবে, যাতে গণতন্ত্রবাদের স্বাধীন, নিরপেক্ষ মত প্রকাশিত হবে সে-সাহিত্যের প্রচার হতে পারবে না। কেবল কৃষক ও শ্রমজীবিদের জীবন যাত্রার কাহিনী ও চিত্র ছাড়া আর কিছুই সাহিত্যে অঙ্কিত করতে দেওয়া হবে না। কারণ, বল্‌শেভিস্‌ট্দের মতে এ সব ছাড়া আর সব সাহিত্য সাহিত্য তো নয়ই, তা হচ্ছে সিডিশন্—দেশ-দ্রোহিতা।

বল্‌শেভিস্‌ট্ রাজত্বের আমলে নবধরণের যে-সাহিত্য গড়ে' উঠ্‌ছিল, তা'র যতটুকু নমুনা আমরা পেয়েছি, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তা কেবল বিপ্লবের স্বল্পখ্যাত ও অখ্যাত, স্বল্পজ্ঞাত ও অজ্ঞাত, কল্পিত ও বাস্তব, স্বল্প-বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ট কথা ও কাহিনীর সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

নামজাদা তরুণ বল্‌শেভিস্‌ট্ সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম লিয়োনোভ্-এর *The Badgers*-নামক উপন্যাসের

মধ্যে বিপ্লবের যে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয়েছে, তা কেবল ছুতোর, রুটিওয়ালা, টুপিওয়ালা, দোকানদার—এই ধরণের নিম্নস্তরের লোকদের তুচ্ছ ও অপদার্থ জীবনের ঘটনার বিবৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর একটি তরুণ বল্‌শেভিস্‌ট্ ঔপন্যাসিক বাবেল্ তাঁর বই *Cavalry Army*-তে, পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে রাশ্যার যুদ্ধ-অভিযানের গল্প বল্‌তে গিয়ে, আগাগোড়া কতগুলি নিরক্ষর, অশিক্ষিত, দুর্বিনীত সৈনিক এবং দুঃসাহসী বল্‌শেভিস্‌ট্ গুণ্ডার বর্ব্বরতা ও হীনাচরণের কাহিনীকে কবিত্বের রঙে রাঙিয়ে প্রোলিটারিয়েটের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করেছেন। বল্‌শেভিস্‌ট্ লেখিকা সাইফুলিনাতার প্রায় প্রত্যেক গল্পেই দস্যু, ঠগী, গ্রাম্য-সর্দ্দার ও দুরন্ত, অত্যাচারী কৃষক-প্রভুকে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীররূপে চিত্রিত করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, বল্‌শেভিস্‌ট্ আমলের নূতন রাশ্যাতে বস্তাবাহী ও বস্তিবাসীর তুচ্ছ, ঘৃণিত ও কদর্য্য জীবনের অসংখ্য খুঁটিনাটিকে একটা রোম্যান্টিক্ রঙ্‌এর পোঁচ্‌রা মাখিয়ে সাহিত্য বলে' চালানো হচ্ছিল।

এখানে হয়তো কেউ-কেউ প্রশ্ন তুল্‌বেন যে, এই কৃষক, কুলী-মজুরই তো দেশের প্রাণ—এদের সুখদুঃখের কথা, দারিদ্র্যের কথা, অভাব-অভিযোগের কথা যদি দেশের সাহিত্যে প্রকাশ না পায়, তা হ'লে সাহিত্য তো কোনো-মতেই সার্থক হ'তে পারে না! যা'রা দেশের মাটি চষে, যা'রা দশের বোঝা বয়, তা'দের জীবন-কাহিনী যদি কোনো আর্টিস্‌টের লেখনীতে ভাষা পায়, তা'হলে সাহিত্যের তো শ্রী-সাধনই হ'বে

গোঁড়া বল্‌শীব দিক দিযে দেখ্‌তে গেলে হযতো এ-সব কথায আপত্তি কব্‌বার কিছুই থাকে না, কিন্তু এই কথা কিছুতেই ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, যাঁবা সাহিত্যেব খাঁটি সমঝ্‌দাব ও গুণী, তাঁরা যখন সাহিত্য-সৃষ্টিব বিচাব কব্‌তে যান্‌, তখন তা'র বিষযবস্তু বা আখ্যানভাগেব অন্তর্নিহিত সমস্যাটিই শুধু বিবেচনা করে ক্ষান্ত না হ'যে, বস-সৃষ্টি হিসেবে সেটা সুন্দব হযেচে কী অসুন্দব হযেচে সে-কথাটাই সবাব আগে ভাবেন।

গোড়াতেই বলেচি যে, সাহিত্যেব কোনো বাঁধাধবা ছাপ্‌ থাকতে পাবে না। সাহিত্যেব দর্‌বাবে, দবদী সমঝ্‌দাবের কাছে, শূদ্র-সাহিত্য বা আভিজাত-সাহিত্য বলে' কোনো ভেদাভেদ নেই। একখানা বইতে চাষীব কথা আছে বলে'ই যে সেখানা সুন্দব ও ববণীয এবং আর একখানা বইতে বড় লোক ও সম্ভ্রান্ত লোকের কথা আছে বলে'ই সেটা কুৎসিত ও পবিহবণীয, এমন কথা মোটেই বলা চলে না। উচ্চাঙ্গেব শিল্পসৃষ্টিব কষ্টিপাথবে পবখ্‌ কব্‌লে তা'ব যেটুকু মূল্য দাঁড়ায সেটুকুই তা'র যথার্থ মূল্য।

বল্‌শেভিক্‌ আমলেব সাহিত্যিকদেব রচনায, যা'কে আমবা সত্যিকাব আর্ট্‌ বলি, এ পর্য্যন্ত তা'ব কোনো প্রকাশ হয নি। তাঁরা কেবল কৃষক-কুলীব জীবনেব ভিতরে যা-কিছু কদর্য্য ও কুৎসিৎ তাব ওপবে একটা কম্যুনিজ্‌মেব তুলি বুলিযে, তা'কেই খাঁটি সাহিত্য বলে' প্রতিপন্ন কব্‌বাব চেষ্টা কব্‌চেন।

বিপ্লবেব আগেব যুগেব বাশ্যাব সাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রা থেকে যে উপাদান সংগৃহীত হয নি,

এমন নয়; প্রচুর হোয়েচে। যাঁরা গর্কীর *Lower Depths* পড়েচেন, তাঁরা জানেন যে, এই নাট্যখানা, যারা অধঃপতনের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেচে, তা'দের যে কদর্য্যতা, কুশ্রীতা, হীনতা ও গ্লানি শুধু তারই চিত্র। গর্কী সেই কদর্য্যতাকে খাঁটি আর্টিস্‌টের মতো জীবন্ত ও বাস্তব করে'ই এঁকেচেন; বল্‌শেভিস্‌ট্‌ সাহিত্যিকদের মতো তা'র ওপর কবিত্বের কাল্পনিক আবরণ দিয়ে তা'কে খামকা মনোহর করে' ফুটিয়ে তোলেন নি; কিম্বা, তাঁর অঙ্কিত প্রতিকৃতিকে রাষ্ট্রনীতিমূলক মতামত দিয়ে বিকৃত-ও করে তোলেন নি।

তারপর ধরুণ দস্তয়েভ্‌স্কির *Crime and Punishment* উপন্যাসের নায়ক—রাস্কল্‌নিকভ্‌। অপরাধী আসামী সন্দেহ নেই, কিন্তু দস্তয়েভ্‌স্কি তা'কে বল্‌শেভিস্‌ট্‌ সাহিত্যিক লিয়োনোভ্‌ বা সাইফুলিনার মতো জগতের শ্রেষ্ঠ বীর বলে' কখনও প্রতিপন্ন কর্‌তে চান্‌ নি; তিনি রাস্কল্‌নিকভ্‌-এর চরিত্রে কেবল মানবাত্মার চিরন্তন জীবন-সংগ্রামই ফুটিয়ে তুলেছেন। তা ছাড়া, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে, রাস্কল্‌নিকভের অপরাধের অন্তরালে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েচে, কিন্তু বল্‌শেভিস্‌ট্‌ সাহিত্যিকদের দস্যু ও অপরাধীর চরিত্রের ভিতরে অভিজাত-সমাজের প্রতি বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

তরুণ বল্‌শেভিস্‌ট্‌ লেখিকা আনা কারাভ্যায়েভা (Anna Karavaeva)-র *The Shoes* নামক একটা গল্প সেদিন পড়্‌ছিলুম। পড়ে' মনে খুবই আশা হচ্ছিল, হয়তো বা এতদিনে রাশ্যান্‌ সাহিত্যে বল্‌শেভিক্‌ গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তির প্রয়াস একটু একটু আরম্ভ হয়েচে।

এই লেখিকা অবিশ্যি গোড়াতে বল্‌শেহ্বিস্‌ট্‌ বিপ্লবের ভেতর দিয়েই তাঁর সাহিত্য-জীবনে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা পেয়েছিলেন, কিন্তু আজ দেখ্‌চি তাঁর দুঃস্বপ্ন ভেঙে গেছে—আজ মুক্তির বাণী তাঁর কানে সাগর-পার থেকে এসে পৌঁছেচে: তাই, আনা কারাহ্বায়েহ্বা বল্‌শেহ্বিস্‌ট্‌-সাহিত্যের নিঃসঙ্গ বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সুদূরের ডাকে চঞ্চল হোয়ে উঠেচেন। তাঁর লেখাতে ভবিষ্যৎ বল্‌শেহ্বিস্‌ট্‌-সাহিত্যেরই কেবল একটা ক্ষীণ আভাস রয়েচে, কিন্তু এত ক্ষীণ, যে তাকে নবারুণোদয়ের অগ্রদূত ব'লে বিশ্বাসই কর্‌তে পারা যায় না।

ফরাসী কথা-সাহিত্য

সব দেশেই নতুন বই বেরোবার একটা মরশুম আছে—বাঙলা দেশে যেমনি পূজোর সময়। ফি বছর ফ্রান্সে জুলাই ও আগষ্ট মাসের মধ্যে বছরের নতুন বই বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে মরশুমের সময় নাছোড়বান্দা প্রকাশকেরা যেমনি করে' খ্যাত ও স্বল্প-বিখ্যাত লেখকদের বই ছাপিয়ে বসে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের নামের জোরে অনেক বাজে বইও বাজারে চলে' যায়—ফ্রান্সে কখনো সে-রকম হ'তে পারে না। কারণ, নাম-করা ফরাসী লেখকদের একটা অভ্যাস আছে—এক বছরে এক-খানার বেশী বই না ছাপানো।

এক বছরে একজন লেখকের একাধিক বই বার হওয়া অবিশ্যি দোষের নয়, কিন্তু যে-দেশে কেবল কয়েকটি লেখকই সাহিত্য-জগতের শিরোমণি বলে' ধরে' নে'যা হ'য়েছে, সেই কয়জনকেই যদি মাসে-মাসে ফরমাস-মতো সব শ্রেণীর পাঠকের খোরাক যোগাতে হয়, তা হ'লে তাঁদের সমস্ত লেখাই যে সমান উঁচুদরের হ'বে, তা আশা করাই বৃথা।

এ-কথা বলা বাহুল্য যে, ফ্রান্সে বাঙলা দেশের চাইতে লেখকের সংখ্যা বেশি এবং ভালো লেখকের সংখ্যাও বেশি। তাই ফ্রান্সে প্রত্যেক লেখক একখানা করে' বই লিখ্‌লেও মোট বই-র সংখ্যা বাঙলা দেশকে ছাড়িয়ে যায়, এবং ফরমাসে' নয় বলে' সে-সব লেখা ভালো সাহিত্য

বলে' ধরা যেতে পারে। হয়তো প্রত্যেক নাম্‌জাদা ফরাসী লেখকেরই কাছে অনেকগুলি বই-ই লেখা হ'যে পড়ে আছে, কিন্তু একবারে একখানার বেশী বই ছাপ্‌তে দিতে যেন তাঁরা খুবই কুণ্ঠা বোধ করেন।

কিছুদিন আগে পিযের্ ব্যনোযা (Pierre Benoit) বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ম্যসিয্য জাহ্‌-লু (M. Jaloux)-র কাছে বল্‌ছিলেন: "আমি এ-বছব অনেকগুলো উপন্যাস লিখে' ফেলেছি, কিন্তু মাত্র একখানাই প্রকাশকদের হাতে দেবো। আমি চাই পাঠক ও সমালোচকেরা আমার একটা বই নিয়েই বেশ কিছুদিন নাড়াচাড়া করুক্—আর এর মধ্যে আমাব বইবও চূড়ান্ত কাটতি হ'যে যাক্।"

প্রায দশ বছর আগেব কথা বলছি—১৯২৭। সে বছবটাতে যে ক'খানা অতি উঁচুদরেব কথা-সাহিত্য ফরাসী ভাষায বেরিয়েছিল, পবেব অনেক বছরের বইর তালিকা খুঁজলে একসঙ্গে তা পাওযা যাবে না। ফ্রান্সের ১৯২৭ সালেব প্রকাশিত বই-ব তালিকাব দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে। নাম-কবা লেখকদেব মধ্যে পল্ মোর (Paul Morand), আঁদ্রে মোরোযা (André Maurois), ব্লেইজ্ সঁদ্রার (Blaise Cendrars), অঁরি দ্য মঁতের্লা (Henri de Monterlant), জর্জ্জ্ বেযার্নানো (Georges Bernanos), জর্জ্জ্ গ্রাপ্ (Georges Grappe)— সবাইবই একখানা কবে' বই কিন্তু, এখনও অনেকেব মতে তাঁদেব প্রত্যেকেরই সব চেযে ভালো বই, সে-বছর বেরিযেছিল।

সে-বছবেব ফবাসী কথা-সাহিত্য সম্ভাবের মধ্যে পল

মোরঁ-র *Rien que la terre* (শুধুই মাটি)-র দিকেই প্রথম নজর পড়ে। নিজের বিদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত অবলম্বন করে'ই তিনি এই বইখানা লিখেছেন। কিছুদিন থেকে, ফ্রান্সের সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে খুব একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে বিদেশ-পর্যাটন করে' ফিরে' এসে নিজেদের ভ্রমণ-সম্পর্কিত ঘটনা নিয়ে বই লেখার দিকে।

ফ্রান্সে এই জিনিষটি খানিকটা নতুন ব'লেই মনে হচ্চে। বালজাক্, ফ্লোবেয়ার্, আনাতোল্ ফ্রাঁস, মার্সেল্ প্রুস্ত্— এঁরা কেউই কোনো-কালে দেশ ছেড়ে বড় একটা বেশিদূর যান্ নি—এমন কী, পিয়ের্ লোতির ভ্রমণ-কাহিনীগুলির ভেতরেও বেশ একটা সুদৃঢ় ফরাসী-সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে।

মোরঁ-র দেখা-দেখি অনেক ছোটখাটো লেখক-ও বছর কয়েকের মধ্যে ভ্রমণের কথা অবলম্বন করে' অনেকগুলো গল্প ও উপন্যাস লিখে' ফেলেছেন। রোলাঁ দর্‌জেহ্‌লে (Roland Dorjelés)-র রোম্যান্টিক্ উপন্যাস *Partir* (বিদায়) একটি সমুদ্রযাত্রী গণিকার প্রেমের কাহিনী। আঁদ্রে মাল্‌রু (André Malroux) তাঁর *La Tentation de l'Occident* (অস্তাচলের টান) বই-এ দু'টি কল্পিত ফরাসী ও চীনদেশীয় লোকের পত্র-লেখালেখি উপন্যাসাকারে দাঁড় করিয়েছেন। ফ্রঁসি দ্য ক্রোয়াসে (Francis de Croisset)-র *La Féerée Cinghalaise* (সিংহল পথযাত্রা) সিংহল ও সিংহলবাসীর সম্বন্ধে গল্প। অঁরি বাশ্‌ল্যাঁ (Henri Bachelin)-র *La Maison d'Annike* (আনিকের বাড়ী) নামক গল্পের বর্ণিত সমস্ত ঘটনা সুদূর আইস্‌ল্যাণ্ড্ দ্বীপে অবস্থিত একটি ইংরেজ যুবকের সঙ্গে

আইস্‌ল্যাণ্ডিক্ সুন্দরী আনিকে-র প্রেমের উপাখ্যান। জঁহ্‌ ক্যাসে (Jean Casset) সুইৎসর্ল্যাণ্ড-এর এক হাসপাতালের যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীদের অভিশপ্ত জীবনের কথা নিয়ে *Les Captifs* (বন্দী) লিখেছেন।

সাহিত্যের খোরাক যোগাবার জন্য দেশবিদেশ ঘুরে' বেড়ানো কেবল ফ্রান্সের সাহিত্য-শিল্পীদেরই একচেটিয়া নয়; আধুনিক ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অল্‌ড্যাস্ হাক্স্‌লি (Aldous Huxley) কিছুদিন হ'ল ভারত-চীন-জাপান-আমেরিকা ঘুরে, দেশে ফিরে'ই *Jesting Pilate* নামে একখানা নব্য ধরণের কথা ও কাহিনী মিশ্রিত গ্রন্থ লিখে' ফেলেছেন। নব্য ধরণের বলচি এই হিসেবে যে, সাধারণ ট্যুরিস্টদের যে-সব দৃশ্য চোখে পড়ে, এবং যে-সব ধরণের ঘটনা তাঁদের মনে লাগে, সে-সব হাক্স্‌লি ইচ্ছে করে'ই যেন বাদ দিয়ে গেছেন। যা-কিছু সৃষ্টিছাড়া, সূক্ষ্ম, অদ্ভুত ও হাস্যোদ্দীপক, সে গুলিই তিনি খুব উৎসাহ-সহকারে বর্ণনা করেছেন এবং বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে সারা দুনিয়ার নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। বইখানির পরিচ্ছেদগুলি বেশ ছোট্ট—প্যারাগ্রাফের মতো করে' লেখা। আর তার প্রত্যেকটাতেই হাক্স্‌লি হয় কোনো একটা বিশেষ দৃশ্য ঘটনা বর্ণনা করেচেন, নয়তো সেই সম্বন্ধে তাঁর সেই সময়কার মনোগত ভাব ফুটিয়ে তুলেচেন। সুন্দর বলে' যার সর্ব্ববাদীসম্মত খ্যাতি আছে, তা তাঁর কাছে একেবারেই সুন্দর লাগে নি: আগ্রার বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল তাঁকে মুগ্ধ কর্‌তে তো পারেই নি, বরঞ্চ যথেষ্ট বিরক্ত করেছে। বিখ্যাত জার্ম্মন্ পণ্ডিত ও দার্শনিক কাইজারলিঙ্‌ তাঁর পৃথিবী

পর্য্যটনান্তে *The Travel Diary of a Philosopher* নামে যে প্রকাণ্ড বইখানা লিখেছেন, তা'র বিশেষত্ব এইখানে যে, তিনি যে-যে দেশ দেখেছেন, তা'র আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিল্প-কলা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, খুব বিশদ্‌ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং বই'র প্রত্যেক অংশেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতা ও কাল্‌চার-এর ভেতরে কোথায় পার্থক্য ও কোথায় সমন্বয় রয়েছে তা যথাযথভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

পল্ মোর্‌ঁ কিন্তু তাঁর বইতে হাক্স্‌লি অথবা কাইজার্‌লিঙ্ কারুরই রচনা-পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। *Rien que le terre* আগাগোড়া পড়লে বোঝা যায় যে, ভ্রমণকালে তিনি যেন কিছুই মনোযোগ দিয়ে দেখেন নি, আর আর যেটুকু দেখেছেন, তা-ও নিতান্ত নিরুৎসাহ-ভাবে। তাই তাঁর বর্ণনার ভিতরে রচনা ও বস্তু-সম্ভারের গভীরতা ফুটে' ওঠে নি। মনে হয়, লেখক কেবল কৌতূহল-পরবশ হ'য়েই যেন নিতান্ত অলস মন নিয়ে, লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে' বেড়িয়েছেন।

কাজেই, বইটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেশ-বিদেশের কতকগুলি ছোটখাটো, অকিঞ্চিৎকর ঘটনার অসংবদ্ধ বিবৃতি ; এবং কতকগুলি পথে-চেনা, শুধু চোখে-দেখা মেয়ে-পুরুষের জলের জাহাজে ও স্থলের হোটেলে বসে' নিত্য-নৈমিত্তিক পানাহার, গান-বাজনা, মন-নিয়ে-কাড়াকাড়ি—এ-সব চিরাভ্যস্ত যাত্রা-পথের কথা।

মোর্‌ঁ-র আগেকার বই *Ouvert la nuit* (সমস্ত রাত খোলা) আখ্যানবস্তুর দিক দিয়ে খুব উঁচুদরের সাহিত্য না হ'লেও, তাতে রচনার সৌষ্ঠব আছে ও বর্ণনাতেও যথেষ্ট

নূতনত্ব আছে। আগের আগের সবগুলি বইতেই তিনি নতুন নতুন স্থান, পাত্র ও অবস্থা নিপুণ শিল্পীর মতো বেশ চিত্তাকর্ষক ক'রে এঁকেছিলেন। তাঁর সে-সব লেখাতে প্রাণের স্পন্দন আছে; তাছাড়া তাঁর রচনা-রীতির ভেতরে মৌলিকতাও আছে। কিন্তু *Rien que le terre* পড়লে মনে হয়, মোরঁ-র লেখাতে ভীমরতি ধরেচে। জীবন্ত, বাস্তব নর-নারীকে ছেড়ে তিনি কেবল পোষাক-পরিচ্ছদে মোড়া প্রাণশূন্য কতকগুলি মোমের পুতুলকে যেন মানুষের মতো ক'রে সাজাতে চেয়েছেন এ বইটাতে। কাউন্টেস্ হ্বিযেরা স্কাই-স্ক্রেইপার-এর ছাদে বসে' কক্‌টেইল্ পান করছেন, আর প্রুস্তের সদ্যপ্রকাশিত বই-র পাতা উদাসীন-ভাবে উল্টে' যাচ্ছেন—এই ধরণের চিত্রেই বইটা ভরে' গেছে। বই-র এক তৃতীয়াংশ এশিয়ার হোটেলের বর্ণনায় ছেয়ে গেছে; আর বর্ণনাগুলি আমেরিকার তৃতীয়-শ্রেণীর সেন্‌সেইশ্যান্‌ল্ খবরের কাগজের শর্টহ্যাণ্ড্ রিপোর্টারের হাত-গড়া, মন-গড়া ছাই ভস্মের মতোই। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই বইতে মোরঁর উন্নাসিকতা (snobbishness) তাঁর আর্ট্‌-কে খর্ব্ব ক'রেচে, কিন্তু এই মোরঁ-ই একদিন কথার চাতুরী, বর্ণনার বিন্যাস, প্রাণ-খোলা ব্যঙ্গ-কৌতুক দিয়ে প্যারিসের বুল্‌হ্বা-সাহিত্যে নতুন সুর ও রস সঞ্চার করেছিলেন।

আঁদ্রে মোরোয়া-র *Mape*-এর যে-রকম কাট্‌তি হ'য়েছে, তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক, হয় বইখানা খুব উঁচুদরের, না হয় জনসাধারণের খুব রুচিগত। আস্তে আস্তে ফরাসী-কথা-সাহিত্যে মোরোয়ার প্রতিপত্তি এত বেড়ে গেছে যে

তাঁর বই ভালো কী মন্দ, তা বিচার করে' আজ বড় কেউ তাঁর বই কিন্‌ছেন্‌ও না, পড়্‌ছেনও না। নইলে, "মাপ্‌" নিয়ে এতটা হৈ-চৈ হ'বার বিশেষ কোনোই কারণ ছিল না।

ইংরেজ কবি শেল্যির জীবনী অবলম্বন করে' *Ariel* লিখ্‌বার পর থেকেই মোরোয়ার নাম ফ্রান্সের বাইরে, বিশেষ করে' ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়, খুবই ছড়িয়ে পড়েছে। 'এইরিএল্‌'-কে সর্ব্বতোভাবে শেল্যির জীবনী বল্‌লে ভুল হ'বে: 'এরিএল্‌' হচ্ছে শেল্যির জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে' লেখা একখানা উপন্যাস।

মোরোয়া-র বিশ্বাস যে, জগতের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রায় বেশির ভাগই হচ্ছে লেখক-লেখিকার আত্ম-কথা। সুতরাং তিনি ঐতিহাসিক ধরণের জীবনী লেখা মোটেই পছন্দ করেন না। প্যারিসের বিখ্যাত সাহিত্য-সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা *Les Nouvelles Littéraires*-এর সম্পাদক ম্যসিয়্য ফ্রেদেরি ল্য ফ্যেহ্ব্‌র্‌ (M. Frédéric le Fèvre)-র কাছে তিনি এ-সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট করে' যে-সব কথা বলেছেন, তা পড়্‌লে এই নব্য ধরণের জীবনী-লেখা সম্বন্ধে মোরোয়া-র মতামত অনেকটা বোঝা যাবে। সেই কথোপকথনের ইতিহাসটা এই:

১৯২৬ সালের ২১শে এইপ্‌রিল্‌ ও ১লা মে-র *Les Nouvelles Littéraires*-এর দু' সংখ্যাতে মোরোয়া ও ল্য ফ্যেহ্ব্‌র্‌-এর কথোপকথন বেরিয়েছিল। সংক্ষেপে, মোরোয়া বল্‌ছেন: এমনকি দেকার্ত-এর মতো গণিতশাস্ত্রবিদের *Discours de la Méthode* বইখানাও হচ্ছে উপন্যাস—'a

novel of ideas'. মোরোয়া-র মতে, মানুষের এই ঘটনাবহুল পরিদৃশ্যমান জগৎ ও আর্টিষ্টের কল্পলোক এ দু'টোর মধ্যে তফাৎ রয়েছে। কেননা, মানুষের জীবনধারার ভেতরে কোনো আগাগোড়া মিল নেই; ক্ষণে ক্ষণে, পলে পলে, তা'র গতি অসমছন্দে চলেছে। কিন্তু উঁচুদরের সাহিত্য-সৃষ্টির ভেতরে রয়েছে একটা সংবদ্ধতা, একটা ধারাবাহিক সামঞ্জস্য। কাজেই, যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবন-কাহিনী অবলম্বন করে' কোনো কথা-সাহিত্য রচনা করতে হয়, তা হ'লে লেখককে অনেক বাধা সইতে হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ল্য ফ্যেহ্বর্ মোরোয়া-র সব কথায় সায় দিতে পারেন নি।

শ্যেলি সম্বন্ধে বই লিখতে অবিশ্যি মোরোয়া-র খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি; তা'র কারণ, হ্যারিয়েট্, ম্যেরি ও জেইন্—শুধু এই তিনটি মাত্র প্রাণীকে কেন্দ্র করে' শ্যেলির যে জীবন-চিত্র আমাদের চোখের সুমুখে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন তা'র একটা নাটকীয রূপ রয়েছে। এবং তা' নিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি করা খানিকটা সহজ-ও। মোরোয়া সে-কারণেই বোধ হয় 'এইরিয়েল্' এত চিত্তাকর্ষক ক'রে লিখতে পেরেছেন। শ্যেলির মৃত্যু হয অল্প বয়সে, ক্ষয়িষ্ণু প্রৌঢ়ত্বের অলস সুখ-সম্ভোগের নিশ্চিন্ত শৈথিল্য, বা জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্যের উদাসীন, নিশ্চেষ্ট পরিসমাপ্তি—কিছুই শ্যেলির জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি। শ্যেলি যতদিন বেঁচেছিলেন, তাঁর প্রাণের প্রদীপ যৌবনের মন্দিরে সহস্র শিখায জ্বলেছিল, উদ্দাম উচ্ছ্বাসের ফেনার আবর্ত্তে তিনি তলিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর অল্প ক'বছরের জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে

পড়েছিল একটা স্বচ্ছন্দ, উন্মুক্ত প্রাণের স্বচ্ছ, সহজ রস-ধারা। তবুও মোরোয়া বলেছেন :

> In fact, Shelley is an ideal subject Yet, even in his case, I laboured under difficulties. Sometimes I would say to myself · 'But why does he go on a trip just when I so need him to stay where he is ?'

কিন্তু মানুষের জীবন তো জটিল ; সত্য ও বাস্তব ঘটনার ওপর উপন্যাস বা নাটক দাঁড় করাতে গেলে যেমন অনেক ঘটনা একবারে বাদ দে'য়া চলে না, তেমন আবার তা থেকে কিছু কিছু বাদ না দিলেও সুন্দর, সৌষ্ঠবসম্পন্ন কথা-সাহিত্য লেখাও চলে না। শুনেচি, শেলির সম্বন্ধে একখানা বই লিখবার ইচ্ছা নাকি অনেক দিন ধরে'ই মোরোয়া-র মনকে উত্তেজিত কর্‌ছিল। এই ইংরেজ কবির জীবনে তিনি যে উচ্ছ্বাসপূর্ণ আদর্শবাদ লক্ষ্য করেছিলেন, সে আদর্শ-বাদ তাঁর নিজের মধ্যেও আছে বলে'ই শেলির জীবনের ঘটনা মেরোয়া-র হৃদয় এমন গভীর সুরে সাড়া দিয়েছিল বোধ হয়।

মোরোয়া যখন কলেজে পড়তেন, তখন কেবল কাব্য ও দর্শন-শাস্ত্র নিয়েই সময় কাটাতেন। কলেজের অনুকূল আবহাওয়ার ভেতরে তাঁর রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ দিন-দিন বেড়েই চল্‌ছিল , কবিত্বের পক্ষপুটে চড়ে' তাঁর যৌবনোদ্দীপ্ত কল্পনা প্রতিদিন যে-জগৎ রচনা কর্‌তো, তা'র মধ্যে বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা ও নির্ম্মমতার কোনো আঁচ ছিল না। কাব্য দিয়ে জীবনে সব পাওয়া যায়, এমনকি বোধ হয় বিশ্বও জয় করা চলে, এই কথাটাই তাঁর মনকে তখন অধিকার করে' থাক্‌তো। কিন্তু ইয়োরোপের মহাসমরের মধ্যে তিনি

মানুষের অকারণ নিষ্ঠুরতার যে নগ্ন ছবি দেখলেম, তা'তে তাঁর অন্তরের যৌবনোদ্দীপ্ত ভাববিলাসিতা এত বড় ঘা খেলো যে তা'তে তাঁর চিন্তা-ধারার আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গেল।

ভগ্ন দেহমন নিয়ে মোরোয়া নিজ গ্রামে ফিরে' এসে যখন পিতৃদত্ত একটা ছোটখাট কারখানার মালিক হ'য়ে বস্‌লেন তখন থেকে তিনি নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামের ক্লেশ ও গ্লানি যেন আরো বেশী করে' বুঝতে সুরু কর্‌লেন। তাঁর ব্যবসায়ের অবস্থা ছিল খারাপ, পুরোপুরি দশ বছর ধরে' তাঁকে কাজের ঘানিতে কলুর বলদের মতো ঘুরতে হোলো দিনরাত। এম্‌নি সময় একদিন শেলি-র চিঠিপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে 'এইরিএল্'-এর পরিকল্পনা উদিত হোলো তাঁর মানস-পটে। এই হোল *Ariel*-রচনার ইতিহাস।

'এইরিএল্'-এর মতো বাস্তব ঘটনার ওপর কল্পনার রঙ্ লাগিয়েই মোরোয়া 'মাপ্' লিখেছেন। 'মাপ্' কী, 'মাপ্' কোথায়ই বা? 'মাপ্' হ'চ্ছে সেই কল্পলোক, যেখানে শিশুদের রূপকথার পরীরা নিত্য বিহার করে; যে-দেশে মানুষ সংসারের তীব্র জ্বালায় জর্জ্জর হ'য়ে শেষ আশ্রয় নেয়, যেখানে গিয়ে রস-স্রষ্টারা মনের আরাম লাভ করে, যেখানে মানুষের সব স্বপ্ন সফল হয়, সত্য হয়। এই 'মাপ্'-এর একজন বাসিন্দা হচ্ছেন গ্যেটা (Goethe)—যৌবনমদে মত্ত, অনভিজ্ঞ যুবক গ্যেটা, ফ্রয়্‌লাইন্ শার্লট্ বুফ্-এর প্রেমে আত্মহারা। প্রেমিক যুবক গ্যেটা বসে' বসে' 'হ্বেযার্‌টার্'-এর মর্ম্মন্তুদ কাহিনী লিখছেন, ছত্রে-ছত্রে তাঁর ক্রন্দনের আর্ত্ত

ব্যাকুলতা উচ্ছ্বসিত হ'যে উঠ্ছে ; তাঁব প্রত্যেকটি আখর যেন বিবহীব অশ্রুজলে সিক্ত। গ্রন্থকাবের ইঙ্গিত এই যে, 'মাপ্'-বাসী জার্ম্মন্ 'ডনহুযান্'-গ্যেট্য তাঁর নিজেরি মতো সত্য ঘটনাকে অবলম্বন কবে'ই *Werther* লিখেছিলেন।

'মাপ্'-এব দ্বিতীয় অধিবাসী এবাব আর কবি কিংবা সাহিত্যিক নন—তিনি একজন উৎসাহী বালজাক্-ভক্ত। এই ভক্ত-প্রবব বালজাকের বই পড়ে' পড়ে' এমনি ভাবেই তা'ব জীবনের প্রণালী নির্দ্দিষ্ট কবেছে যে তার চলা-ফেবা, হাব-ভাব, চিন্তা-ভাবনা সবই বালজাক্-সৃষ্ট অসমসাহসী নাযকদেব মতোই হ'যে পডেছে। অস্কাব্ ওযাইল্ড্ বলেছেন : "Life imitates art much more than art imitates life." কাজেই, যদি কেউ জীবন ভ'বে' কেবল কাব্যের অনুকবণ কবেই চলে, তা হ'লে তা'ব যে-দুর্দ্দশা হ'য়ে দাঁডায মোবোয়ান 'মাপ্'-বাসী বাল্জাক্-ভক্তেবও তা হবেই।

'মাপ্'-এব তৃতীয় বাসিন্দা হচ্ছেন ইংবেজ অভিনেত্রী, মিসেস্ সিড্ন্স্। মোবোযাব তূণে যতগুলি শ্লেষ ও বিদ্রূপ-বিষাক্ত বাণ ছিল, সবই বোধহয তিনি নিক্ষেপ কবেছেন 'মাপ্'-এব এই অধিবাসিনীটিব ওপব। গ্যেট্য বা বাল্জাক্-পাঠকেব চবিত্র-অঙ্কনে মোবোযা তবু যাহোক্ কিছু বা সহানুভূতি দেখিযেছেন, কিন্তু মিসেস্ সিড্ন্স্ তাঁর 'মাপ্' কাব্যের নিন্দিতা, উপেক্ষিতা। তাব ওপব তাঁব সৃষ্টিকর্ত্তা একটু করুণাবাবিও সিঞ্চন কবেন নি। এমনকি, যখন অভিনেত্রী ব্যর্থ-প্রেম হ'যে, মেযে হাবিযে, শোকাতুর হৃদযে আর্ত্তনাদ কবছে, সেই অবস্থা বর্ণনা কবতে গিয়ে

অতি উদাসীন তাচ্ছিল্যেব স্বরে মোরোয়া বলেছেন: "মিসেস্ সিড্‌নস্ বোধ হয় এর চাইতে ভালো অভিনয় আর জীবনে করে নি!" কী নিষ্ঠুব পরিহাস!

'মাপ্'-এর মোটামুটি মর্ম্ম-কথা হচ্ছে: জীবনের ওপব আর্টের প্রভাব। কথা-সাহিত্য হিসেবে এই বইখানা ততো উপাদেয না হলেও এখানা যে ভালো ব্যঙ্গ-সাহিত্য হ'যে দাঁড়িয়েছে, সে কথা মান্‌তেই হবে। লেখকের ব্যঙ্গ-কৌতুক যতই তীক্ষ্ণ ও ঝাঁজালো হোক্ না কেন, রচনা মাধুর্য্যেব জন্ম তা অনেকটা সহনীয হযেছে। সব চরিত্রগুলি অবিশ্যি খুব স্পষ্ট হ'যে ফুটে ওঠে নি—যেন একটা আবছাযায আচ্ছন্ন হ'যে রযেছে। তবুও তাবা প্রায প্রত্যেকেই খুব জানাশোনা লোক বলে' তাঁদের ভেতরের রূপ চিনে নিতে বেশী কষ্ট হয় না। চরিত্র অঙ্কন ও পরিকল্পনার চাইতে মোরোযা এই বইখানাতে ভাষার বাহাতুরীই বেশী দেখাতে চেযেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে মনস্তত্বের দিক দিযে অনেকেই জীবনী লিখেছেন। ইংল্যণ্ডে লিটন্ ষ্ট্রেইচী, আমেরিকায গ্যামেলিযেল্ ব্র্যাড্‌ফর্ড, জ্যর্ম্মণীতে এমিল্ লুড্‌হ্বিথ্ বর্ত্তমান যুগে জীবনী-রচনার ভেতবে একটা নূতন ধারার সৃষ্টি করেছেন। ষ্ট্রেইচীব *Queen Victoria*, ব্র্যাড্‌ফর্ড-এর *Damaged Souls* ও লুড্‌হ্বিথ্-এব *Bismarck*, ব'লতে গেলে, এ-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-কথা। বিদেশের এই নব্য-ধরণের জীবনী-রচয়িতাদেব বিশেষত্ব এইখানে যে, তাঁরা ঘটনাগুলিকে সজ্জিত ও সুসংবদ্ধ করে' বর্ণিত জীবনের ভালো-মন্দ কীর্ত্তি-অকীর্ত্তি, ক্ষয-ক্ষতির ভেতব একটা সামঞ্জস্য দেখিযে, জীবন্ত মানুষটাবই পরিপূর্ণ রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

এঁদের প্রবর্ত্তিত এই নূতন লিখনভঙ্গীতে জীবনী-রচনা, সঙ্গীত ও কলা-বিদ্যার মতোই আর একটি আলাদা ও বিশিষ্ট আর্ট হ'যে দাঁড়িয়েছে।

বাঙলা ভাষাতে এই প্রণালীতে লেখা উৎকৃষ্ট জীবনী এক রকম নেই বললেই হয়। চণ্ডীবাবুর "বিদ্যাসাগর" বা দেবকুমারবাবুর "দ্বিজেন্দ্রলাল" ধরণের গ্রন্থ একদিকে যেমন অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট, তেমনি আবার এঁদের বর্ণনা-পদ্ধতির ভেতরে বিশেষ কোনোই মৌলিকতা নেই। এসব বইতে ঘটনা এসে এত ভিড় করেছে যে, তা থেকে মানুষের আসল চেহারাটি ধরা যায় না। ঐ ধরণের জীবনী হয়ে দাঁড়ায় ক্যালেণ্ডারের বীল্—মানুষকে দেখি অযথা প্রশংসায় স্ফীত, না হয় একটা কল্পিত অতিমানুষের অশরীরী সংস্করণরূপে। এ দেশে একমাত্র স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী জীবনী-রচনাকে একটা নতুন ছাঁচে গড়ে' তুলতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তা-ও বড় বেশী কথা ও ভাষার ভারে নিপীড়িত।

জীবনী-রচনা কেবল জ্ঞাত ও জ্ঞাতব্য ঘটনার বিবৃতি নয়; জীবনের ভেতরে যে অন্তর্নিহিত ভাবধারা থাকে—মানুষের প্যর্‌সোনালিটির কারণ ও ব্যবহার, তাকে উন্মুক্ত করতে না পারলে সেটা হয় না জীবনী-সাহিত্য, হয় ক্যাটালগ্।

ব্লেইজ্ সঁদ্রার' নাম-করা উপন্যাস *Moravigne* প্যারিসের কোনো কোনো সাহিত্যদলের কাছে খুব বাহবা পেয়েচে; তা'র একমাত্র কারণ বোধ হয় গল্পটার মৌলিকতা। প্রথমতঃ, বইখানি আগাগোড়া উত্তম-পুরুষে লেখা এবং এই উত্তম-পুরুষের ব্যক্তিটি হচ্ছেন একজন বিপ্লব-পন্থী ও স্বদেশদ্রোহী। তার সঙ্গে মোরাহ্ব ফ্রিন্-এর

দেখা হয় প্রথমে একটা পাগলা-গারদে। সেখান থেকে মোরাহ্ব্রিন্কে উদ্ধার করে' সে পালিয়ে যায় রাশ্যাতে। সেখানে দু'জনে মিলে জারকে হত্যা করবার জন্যে একটা দল পাকায়। এই দল গঠনের পরিকল্পনায় বোধ হয় সঁন্দ্রার অনুপ্রেরিত হ'য়েছেন দস্তয়েএফ্স্কি-র *The Possessed* (ভূতে পাওয়া) নামক বইখানা থেকে। কিন্তু দু'বন্ধুর মৎলব সিদ্ধ হয় না; তখন তারা রাশ্যা থেকে পালিয়ে এসে অনেক বছর আমেরিকাতে ও ইয়োরোপে খুব ঘোরাঘুরি করলো এবং শেষে ফ্রান্সে এসে আস্তানা গাড়লো। কিছুদিনের মধ্যেই ইয়োরোপে লড়াই সুরু হ'ল; লড়াইর সময়টাতে দু'জনে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল পরে মোরাহ্ব্রিন্-এর সঙ্গে স্বদেশদ্রোহীর দেখা আবার সেই পাগ্লা-গারদে। মোরাহ্ব্রিন্ বন্ধুকে চিন্তে পার্লে না। এই হোলো মোটামুটি গল্পের প্লট্।

সঁন্দ্রার' চরিত্র ও ঘটনা-বর্ণন বড় অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট; নইলে বইখানা সব দিক দিয়ে বেশ উপাদেয়ই হয়েছে। হ্বল্তেয়ার্-এর *Candide* ঠিক যে-ধরণের গল্প, *Moravigne*-ও অনেকটা সেই ধরণের। হ্বল্তেয়ার্-এর ব্যঙ্গ-ভঙ্গী যেমন তীব্র ও সর্ব্বনাশী, সঁন্দ্রারও খানিকটা তাই। সঁন্দ্রার সাহিত্যের কোনো শাসন মান্তে রাজী নন্। এ-পর্য্যন্ত যে কয়খানা বই তিনি লিখেছেন, তার প্রত্যেকটাতেই, মানুষের মার্জ্জিত, রুচি-সম্পন্ন বৃত্তিগুলিকে তিনি আগাগোড়া উপহাস করে' আস্ছেন। তাঁর কাছে প্রেম, উচ্চাকাঙ্খা, আদর্শবাদ— এর কিছুরই স্থান জীবনে বা সাহিত্যে নেই। এই জন্যেই

বোধ হয়, Moravigne-এর আরম্ভ পাগ্‌লা-গারদে, শেষও পাগ্‌লা-গারদে। মানব মনের বিকৃতি ও মতিচ্ছন্নতাকেই সঁন্দ্রার বড় করে' দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। বিদেশী বইর বাজারে এই ধরণের উপন্যাসেরই আজকাল বেশী কাটতি— আমরা ফ্রয়েডের যুগের মানুষ কিনা!

অঁরি দ্য মঁতেরল্‌ঁ সঁন্দ্রার থেকে একেবারে বিভিন্ন ধরণের ঔপন্যাসিক। অনেকদিন ধরে' তিনি *'littérature du sport'*, মানে, একটা খেলাধূলা ও কুস্তিগিরির সাহিত্য গড়্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন। প্রত্যেক গল্পেই তিনি তাঁর নায়ক-নায়িকার হৃদয় ও আত্মা নামক বস্তুটিকে বেমালুম অস্বীকার করে' কেবল তা'দের রক্ত-মজ্জা-মাংস-পেশীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা অবিশ্যি অন্যান্য মানুষের মতোই কষ্ট পাচ্ছে, আনন্দও পাচ্ছে, আঘাত পেয়ে পেয়ে কেউ কেউ শেষে দুঃখ জয়ও করছে; কিন্তু সবাই শুধু তাদের দেহটার কথাই ভাবচে, মন নিয়ে বোঝা-পড়া করবার তাদের অবসর নেই।

মঁতেরল্‌ঁ-র শরীরতত্ত্ব নিয়ে লেখা এ-সব গল্পে চরিত্র-কল্পনার রীতিটা অভিনব, কিন্তু দুঃখের বিষয় রচনার ভঙ্গী বড়ই প্রাণহীন ও দুর্ব্বল। তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাস *Les Bestiaires* (জানোয়ার)-এ বিশেষ কিছু উপাদেয় জিনিষ নেই। কিন্তু বইখানা বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্যারিসের নানা সংবাদপত্রে গুজব বেরুলো যে মঁতেরল্‌ঁ হঠাৎ ষাঁড়ের যুদ্ধের খুব ভক্ত হ'য়ে উঠেছেন এবং শীগ্‌গিরই নাকি নিজে একটা ষাঁড়-যুদ্ধ খেলায় যোগদান কর্‌বেন, এবং শেষটায় এ-ও শোনা গেল যে, খেলার পর তিনি প্রাণান্তিক ভাবে

আহত হয়ে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। সে যা হোক্, সন্দেহ নেই যে, এই বইটাতে মঁতের্‌লঁ-র আত্ম-জীবনীর কিছু কিছু কথা রয়েছে। গল্পটা যে শুধু কেবল স্পোর্টের এর কথাতেই ভরা তা নয়, তাতে আগাগোড়া একটা মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌ -এর সুর রয়েচে। মঁতের্‌লঁ দেখাতে চেয়েছেন যে ষাঁড়ই হচ্ছে শয়তানের প্রতীক; এই শয়তানকে ভাববিলাসিতার কুসুম-শর দিয়ে আঘাত কর্‌লে কোনো ফল হবে না; তাকে জয় করতে হলে চাই দুর্জ্জয় মাংশপেশীর বল—এই কথাই মঁতের্‌লঁ বল্‌তে চেয়েছেন।

মহা-সমরের পর থেকে সমগ্র ইউরোপে যে নূতন হাওয়া বইতে সুরু হ'য়েছিল, তা সেই-সময়কার ফরাসী সাহিত্য আলোচনা কর্‌লে বেশ টের পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ও দুনিয়ার বাসিন্দাদের কর্ম্মে ও চিন্তা-ধারায় একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ১৯১৩ সালের মানুষের ভাব-জগতের সঙ্গে ১৯৩১ সালের মানুষের অন্তর্লোকের ছিল অনেক প্রভেদ। অন্যান্য দেশের মতো ফ্রান্সে-ও সাহিত্য-জগতে আত্মিক স্বাধীনতা ও সত্য উপলব্ধি কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা হ'য়েছিল এবং আজও তা' বিদ্যমান। ধর্ম্ম, শরীর-বিজ্ঞান, যৌন-তত্ত্ব, প্রেম-রহস্য, এসব নিয়ে সে-দেশের কাব্যে, কথা-সাহিত্যে ও নাটকে নির্ভীক, প্রাণ-খোলা বিশ্লেষণ চল্‌ছিল। চেষ্টা হচ্ছিল অর্থহীন ভাব-বিলাসিতাকে সাহিত্যের আসন থেকে চ্যুত করা যায় কী ক'রে, যা হ'লে সাহিত্যের দরবারে কৌলীন্য থাকবে না, সামাজিক হিতবুদ্ধির বাধা থাকবে না, শিল্পীদের লেখনী হবে কথার শুচিতার সংস্কার থেকে মুক্ত।

বালজাক্ ও জোলার রিয়ালিজ্‌ম্-এর ভেতরে যে যৌন- মিলনের ঝাঁঝালো দৈহিকতা ছিল তা' সত্যই খানিকটা আজ বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির সুকঠিন ও তীক্ষ্ণ নজরে পরিমার্জ্জিত হ'য়েচে। আনাতোল্ ফ্রাঁসের ব্যঙ্গ-রসের ভেতরে যে তীব্র লালসা ও উত্তেজনার বিস্বাদ ছিল, তাকে আস্তে আস্তে মার্সেল্ প্রুস্ত্-পন্থীরা সহজ আনন্দ-ভোগের মাধুর্য্য দিয়ে সরস করতে চেষ্টা করেছেন। তা'র ফলে এ যুগের ফরাসী কথা-সাহিত্য অনেক মোলায়েম হয়েছে।

এতকাল যে-সব রহস্য নিছক বিজ্ঞানের অন্তর্গত ছিল, এবং লেখকের চোখে যা'র কোনোই সাহিত্যিক মূল্য ছিল না, তা'কে বর্ত্তমান যুগের রস-সন্ধানীরা সাহিত্য-সৃষ্টির ভেতর দিয়ে উদ্‌ঘাটিত করতে চেষ্টা করেছেন। জীবনের অজ্ঞেয় ও দুর্জ্ঞেয় বস্তু—যার বাস্তব ব্যবহারে কোনো দাম ছিল না—তা-ও সাহিত্য-কলায় আজ স্থানলাভ করেছে।

অনেকে হয়তো ভয় পাচ্ছেন এই ভেবে যে, এই একান্ত বে-আব্রু স্বাধীনতার ফলে ইয়োরোপে যে-সাহিত্য গড়ে' উঠ্‌ছে, অনাগত কালে তা'র কোনো কিছুরই সার্থকতা থাক্‌বে না। কিন্তু সে-বিচারে আজ আমাদের কোনো অধিকার নেই, হাটের ভিড় থেকে যে-কোলাহল উত্থিত হচ্ছে, আমরা তা'র এত কাছে আছি যে, তা'র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার করা আমাদের পক্ষে আজ সম্ভব নয়। সে-বিচারের ভার অনাগত কালের নবীন রস-সন্ধানীদের হাতেই রইল। দৈহিকতাকে জ্ঞানবজ্র নিয়ে সংহার করতে পারলেই হয় মানুষের দেহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জয়লাভ—শুধু এই কথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

এই সময়কার আরো দু'খানা ফরাসী উপন্যাসের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। প্রথমখানা জর্জ্ বেয়ার্ণানোর *Sous le soleil de Satan* (শয়তান-সূর্য্যতলে)। বইটার মূল বিষয় হচ্ছে মহাপুরুষত্ব, এবং মহাপুরুষের লক্ষণ ও বিশেষত্ব। খ্রীষ্ট ভক্ত, বিশেষ করে' ফ্রান্সের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কাছে এই উপন্যাসখানা খুব উপাদেয় হয়েচে। গ্রন্থকার বল্‌তে চেয়েছেন: মহাপুরুষকে তোমরা ঠাট্টা কর্‌তে পারো, তাঁর বাণীকে উপহাস কর্‌তে পারো; কিন্তু দুনিয়াতে তাঁর স্থান আছে, এ-কথা যদি অস্বীকার করো তাহ'লে মনের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামিরই পরিচয় দেবে। কাজেই, মহাপুরুষের ধর্ম্ম বুঝ্‌তে হ'লে, তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও ধারা সবার আগে বুঝ্‌তে হবে।

এ-পর্য্যন্ত বেয়ার্ণানো কথা-সাহিত্য নিয়ে খুব বেশী নাড়াচাড়া করেন নি—তাঁর পেশা হচ্ছে সাহিত্য ও চিত্রকলার সমালোচনা। ফ্রান্সের বিখ্যাত চিত্র-শিল্পীদের সম্বন্ধে তিনি অন্যূন পঞ্চাশখানা বই লিখেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের ওপরেও তাঁর বিশেষ দখল রয়েছে। তাঁর ইংরেজিতে লেখা *A Sketch of English Poetry in the Nineteenth Century* ও ষ্টিভ্‌ন্‌সন্-এর ওপর একখানা ছোট বই-এর নাম কেউ কেউ হয়তো শুনেছেন। বেয়ার্ণানোর সমসাময়িক, জ্‌হর্জ্জ্‌হ্ গ্রাপ-এর *Une Soiree à Cordoue* খুব কাঁচা হাতের লেখা হ'লেও ফ্রান্সের সাহিত্য-মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। লেখকের ভাষায় বৈশিষ্ট্য নেই—বরঞ্চ তা অস্বাভাবিক রকমে কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু বইখানা আগাগোড়া পড়তে ইচ্ছে হয় এবং পড়লে ভালোও লাগে। স্পেইনের

বিখ্যাত ধর্ম্ম-পীঠ বৈচিত্র্যময় কর্‌দোহ্বার দৃশ্য-বর্ণনাগুলি খুবই জীবন্ত ও স্পষ্ট। এই উপন্যাস ছ'খানি বিশেষ করে উল্লেখ করলুম এই জন্যে যে, একটু আগে ফরাসী কথা-সাহিত্যের যে ভাববিলাসিতাহীন, বে-আব্রু, বিজ্ঞান-গর্ভ চিন্তা ও পদ্ধতির কথা বলেছি, এ বই দুটো ঠিক তার উল্টো ভাবে লেখা।

রোমান্টিসিজ্‌ম্ মানব-মনের ও সাহিত্যের এমন একটা শক্ত বাঁধন, যে তাকে পরিপূর্ণ ভাবে কাটিয়ে উঠ্‌তে, কিংবা তাকে একেবারে বেমালুম অস্বীকার করতে আজ পর্য্যন্ত কোনো সাহিত্য, ও সাহিত্য-শিল্পী পারে নি, পারবেও না বোধ হয়। চল্‌তি সময়ের প্রভাবে ও দেশ-পাত্রগত রুচি অনুসারে রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ বাড়ে বা কমে, এই মাত্র।

আনকোরা আইরিশ্

কালাপানি পার হ'য়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সম্ভার নিয়ে যে-পসরা আমাদের কূলে এসে ভিড়চে, তা খুঁজে' অনেকেই সহজে শুন্ ও'কেইসী (Sean O'Casey)-র সন্ধান পাবেন না। এমনকি, আয়ার্ল্যাণ্ডের নাট্য-সাহিত্যের আকাশে একটা ধূমকেতুর মত ও'কেইসী যখন হঠাৎ এসে দেখা দিলেন, তা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিতভাবেই।

এ খুব বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র দশ বছর আগে—১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাসে। একটি বছর ফুরুতে না ফুরুতেই এই আইরিশ্ নাট্যকার ইংল্যাণ্ড্ ও ইংল্যাণ্ডের বাইরে সর্ব্বত্রই শুধু যে সুপরিচিত হয়েছিলেন তা নয়, উপরন্তু সবাই তখন একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর মতো প্রতিভাশালী নাট্য-শিল্পী বিংশ-শতাব্দীতে খুব কমই দেখা দিয়েছে।

অবিশ্যি কথাটা অত্যুক্তি বলে' মনে হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর যে দু'খানা নাটক একই সময়ে লণ্ডন্ ও নিউ ইয়র্কে অভিনীত হয়েছে, দুটোরই ভেতর যে অসামান্য প্রতিভা ও রচনা-কৌশল রয়েচে তা তো কোনোমতেই অস্বীকার করা চলে না।

যেদিন থেকে ইয়েইট্স্ (W. B. Yeats)-এর চেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে ডাব্লিনে Irish National Literary Society স্থাপিত হয়, একরকম বলতে গেলে, সেদিন থেকেই আধুনিক আইরিশ্ সাহিত্যের সূত্রপাত। জে এম্ সিঙ্গ্ (J. M

Synge)-এর মৃত্যুকাল অবধি আয়ার্ল্যাণ্ডের নাট্য-সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রী-বৃদ্ধি হ'য়েছিল। তখনকার দিনে ডাব্‌লিনের Abbe Theatre-এর নাম কে না জানতো? সিঙ্গ্‌ যদি আর কিছু না লিখে' শুধু *The Playboy of the Western World*—ঐ একখানা নাটকই লিখে' রেখে যেতেন, তবুও তিনি বিশ্ব-বিশ্রুত হ'যে থাকতেন। সিঙ্গ্‌-এর মৃত্যুর পর Abbey Theatre-এর দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না; আয়ার্ল্যাণ্ডের অতি সৌভাগ্যের কথা যে ও'কেইসীর উদ্ভব হ'যে তা পুনর্জ্জীবিত হ'য়েচে। ও'কেইসী সম্বন্ধে জেইম্‌স্‌ ষ্টীভন্‌স্‌ খুব সত্য কথা বলেচেন: বর্ত্তমান যুগে আইরিশ্‌ রস-সাহিত্যে শ্যন্‌ ও'কেইসীই সিঙ্গ্‌-এর যথার্থ ও সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

'ডেইলী টেলিগ্রাফ'-এর নাট্য-সমালোচক ডেনিস্‌ জন্‌স্‌টন্‌ বলেছেন: শ্যন্‌ ও'কেইসী বিপ্লবের কবি; কিন্তু আমার মনে হয় ও'কেইসী বিপ্লবান্তের কবি। সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডের ওপর দিযে বহুদিন ধরে একটা প্রচণ্ড ঝড় চল্‌ছিল, আত্ম-কলহ, স্বজাতি-বিদ্রোহ, রক্তারক্তিতে দেশ দুর্দ্দশার চরম সীমায পৌঁচেছিল। উত্তর ও দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে একটা বোঝা-পড়া হ'যে যাওযার পর থেকে দেশে অবিশ্যি খানিকটা শান্তি এসেছে; কিন্তু প্রত্যেক আইরিশ্‌ নর-নারীর বুকে আজো অতীত বেদনার স্মৃতি জমাট রক্তের মতো লেগে রযেছে। দারিদ্র্য ও দুঃখের নিষ্পেষণে এখনো তা'রা মুহ্যমান হ'যে রযেচে।

তা'দেরই মতো ও'কেইসী আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে' বস্তি-জীবনের লাঞ্ছনা ও বেদনার ভেতর

দিযেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার সন্ধান পেযেচেন। মনে হয, সেই জন্যই বোধ হয ও'কেইসী তাঁর দেশকে ও দেশেব অন্তবকে এত ভালো কবে' চিন্‌তে পেবেচেন। কিন্তু এর জন্যে তাঁকে কী কঠোর ও দুঃসহ দাবিদ্র্য-যন্ত্রণা-ই না সইতে হ'যেচে!

অতীতেব পুঞ্জীভূত বেদনা গোটা আইবিশ্ জাতটাব বুকের যে-খান্‌টাতে বাব বাব এসে আঘাত কবে' নব-জাগবণেব আনন্দকে মলিন কবে' দিচ্চে, তাব মর্ম্ম ও'কেইসী অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি কবেচেন। তাই, হৃদযেব বক্ত দিযে আযার্ল্যাণ্ড আজ যে-স্বাধীনতাটুকু পেযেচে, তা'ব দাগ ও'কেইসীব নাট্যেব ওপব পড়েচে, কিন্তু তা ব'লে তাঁব লেখাকে একটুও কলুষিত কব্‌তে পাবে নি। কেননা, দুঃখ সযে'-সযে' তাঁব মন থেকে দুঃখেব কালিমা মুছে গেছে, বিপ্লবান্তে তিনি বিপ্লবকে হাসিব উচ্ছ্বাস দিযে নাকচ কবে' দিতে পেবেচেন। অর্থহীন দলাদলিব ক্ষমাহীন নিষ্ঠুবতাকে, সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রেমকে, প্রচলিত ধর্ম্মেব বুজরুকিকে তিনি নির্ভীকচিত্তে উপহাস কব্‌তে পেবেচেন। তাই বলেচি, ও'কেইসী বিপ্লবান্তেব কবি—নব-অভ্যুদযেব অগ্রদূত।

ও'কেইসীব প্রথম নাটক *Juno and the Paycock*—সেইসমযকাব কথা নিযে লেখা, যখন আযার্ল্যাণ্ডেব স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিপ্লবপন্থী ও 'ব্ল্যাক্ এ্যাণ্ড্ ট্যান্' ব্রিটিশ সৈন্যদলেব মধ্যে মাবাত্মক সংগ্রাম চল্‌ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র কবে' ও'কেইসী এক দবিদ্র বস্তি-পবিবাবেব জীবন-নাট্য বচনা কবেচেন। স্বামীব নাম পেইকক্, স্ত্রীব নাম জুনো, দু'জন দু'জনকে ঠাট্টা করে' ঐ নামে ডাকতো। স্বামী

অলস, অকর্ম্মণ্য, দাম্ভিক, বাক্যবাগীশ, খোস্‌মেজাজী, মাতাল। স্ত্রী চতুরা, কর্ম্মকুশলা, বুদ্ধিমতী, ধর্ম্ম-ভীরু। পেইকক্-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু, Joxer, তার চাইতেও অলস, তা'র ওপরে সে চোর ও গাঁটকাটা।

একদিন স্বামী-স্ত্রী কার মুখে খবর পেলে, তারা হঠাৎ এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'য়েচে। অপ্রত্যাশিত ধন-লাভের আনন্দের আতিশয্যে পেইকক্ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মদের দোকানে খুব বেশী করে মদ খেলো, আর বাজার থেকে সস্তা দামের কতগুলো ঠুন্‌কো, সৌখীন জিনিষ বাকীতে কিনে এনে ঘর-বাড়ি সাজালো: ভাবলো এবার থেকে বড়লোকের মতো থাকতে হ'বে: এম্‌নি ক'রে দিন যায়। কিছুদিন পরে হঠাৎ শুন্‌লো যে টাকা-পয়সা পাওয়ার কথা সব মিথ্যে এবং যে বলেচে, সে তাদের প্রতারণা করেচে। তখন থেকে পেইকক্ পরিবারের দুঃখের সুরু হ'ল।

সংসারের ভালোমন্দের প্রতি চিরকাল উদাসীন পেইকক্ বাইরে গিয়ে মদ খায়, হল্লা করে, আর ঘরে ফিরে' স্ত্রী, ছেলে-মেয়ের সুমুখে নিজের বড়াই করে। পঙ্গু ও ভগ্নদেহ ছেলে Johnny-কে একদিন 'informer' বলে' পুলিশে সন্দেহ করে' ঘর থেকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলো ও পরে গুলি করে' মারলো। তার খানিকক্ষণ পরেই প্রতিবেশিনী Mrs Tancred এসে জুনোকে তার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর খবর জানালো। স্বামী এদিকে মদ খেতে বাইরে গেছে, আর মেয়েটা কোনো একটা বাইরের লোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। পুত্রহারা, শোক-সন্তপ্তা জুনো আর

সইতে না পেরে Virgin Mary-র প্রতিমূর্ত্তির সামনে নতজানু হ'যে বসে' আর্ত্তনাদ করচে :

"What was the pain I suffered, Johnny, bringin' you into the world to carry you to your cradle to the pains I'll suffer carryin' you out o' the world to bring to your grave ! Mother o' God, have pity on us all ! Blessed Virgin, where were you when me darlin' son was riddled with bullets, when me darlin' son was riddled with bullets ? Sacred Heart o' Jesus, take way our hearts o' stone and give us hearts o' flesh ! Take away this murdherin' hate, an' give us Thine own eternal love !"

এইখানে যবনিকা পতন হ'লে নাটকখানা যে ট্র্যাজেডি হোতো এবং হয়তো এক ধরণের নাট্যামোদীর কাছে খুব চিত্তাকর্ষক-ও হোতো, যেমন ধারা বাঙলা রঙ্গমঞ্চে করুণরসাত্মক নাটক সচরাচর হ'যে থাকে। বাঙলা নাটকে যত বেশী কান্না ততই হবে তা পপ্যুলার; বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে এখন-ও কান্নাকাটিরই যুগ চল্‌চে। কিন্তু ও'কেইসী বাস্তব নাট্যের একজন খাঁটি শিল্পী, তাই তিনি নাটকের শেষ করলেন পেইকক্ ও তার বন্ধু জক্‌সারের সব-দুঃখ-ভোলা মাত্‌লামির হাস্য-কলরোল দিয়ে।

মদের নেশাতে দু' বন্ধুকে এম্‌নি ধরেচে যে, তা'রা যখন শূন্য, অন্ধকার ঘরে এসে ঢুক্‌লো তখন আর সাম্‌লাতে না পেরে মাটির ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগ্‌লো। তা'দের কথার তরঙ্গে ট্র্যাজেডির ব্যথা কোথায় উবে গেল। তাদের অস্ফুট, অস্পষ্ট আবোল-তাবোলের মধ্য দিয়ে যেন

আয়াল্যাণ্ডের ভবিষ্যতের স্বপ্ন জেগে উঠ্লো: "Ireland sober is Ireland free." অর্দ্ধ-মুদ্রিত চোখ বগ্‌ড়াতে বগ্‌ড়াতে পেইকক্ ব'লে উঠ্লো: "I'm telling you ·· Joxer ··th' whole worl's in a terr·· ible state o'chassis !"

সঙ্গে-সঙ্গেই যবনিকা নেমে এলো।

ও'কেইসীর দ্বিতীয় নাটক *The Plough and the Stars* ১৯১৬ সালে ইষ্টার-সপ্তাহে, ডাব্‌লিন্-এ যে-ভীষণ মারামারি ও খুন্-খারাবী হয়েছিলো, তা'রই ঘটনা অবলম্বন ক'রে' লেখা হয়েচে। Abbey Theatre-এ এই নাটকের চতুর্থ অভিনয়-রজনীতে ভয়ানক গোলমাল হয়। আইরিশ্ মেয়েরাই বিশেষ ক'রে' এ-গোলমালের সূত্রপাত করে। পালা প্রায় অর্দ্ধেকের কাছাকাছি, এম্‌নি সময় দশবারোটি মেয়ে উত্তেজিত হ'য়ে চীৎকার কর্‌তে-কর্‌তে রঙ্গমঞ্চে উঠে এলো—সঙ্গে সঙ্গে একটি দুর্বিনীত যুবক ভিড় ঠেলে ওপরে উঠে' সুমুখের দৃশ্য-পটটা ছিঁড়ে ফেল্‌লো।

ও'কেইসী এই নাটকে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েচেন, দেশদ্রোহিতা প্রচার করেচেন—এই নিয়ে শ্রাব্য ও অশ্রাব্য ভাষায় কথা-কাটাকাটি চল্‌তে লাগলো—শার্দ্দূল-সুলভ বিকৃত মুখধ্বনি চতুর্দ্দিক বিদীর্ণ কর্‌তে লাগলো—হাতের লাঠি, পায়ের জুতো মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি খেতে লাগলো—শেষটায় আয়াল্যাণ্ডের নাট্য-শিল্পীকে পুলিশের আশ্রয় নিয়ে সে-রাত্রের মত উদ্ধার পেতে হোলো। ইয়েইট্‌স্ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হ'য়ে জনতার সুমুখে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন: আইরিশ্‌দের এ-আচরণ অতি জঘন্য ও অমার্জ্জনীয়—এ খবর

শুনে তুনিযার লোক হাসবে। কিন্তু, সেদিন থেকেই ও'কেইসীর বিজয-যাত্রা সুরু হ'ল—স্বদেশবাসীব কাছ থেকে তাঁর নবোদ্গত মণীষার ওই প্রথম পুরস্কাব।

সত্যি ভাবলে অবাক হ'তে হয যে, ডাবলিন্‌বাসীবা *Juno and the Paycock* খুসীব সঙ্গে হজম কবলো—আব *The Plough and the Stars* তাদেব সহ্য হ'ল না। তুটো বই-ই তো একই ছাঁচে ঢালা, তফাৎ এই যে, *The Plough and the Stars*-এ আইবিশ্-চবিত্রেব স্বরূপ একটু বেশী স্পষ্ট কবে' পবিস্ফুটিত হযেচে। সেটাই বোধ হয তাদেব সহ্য না হওযাব কারণ। ক্যালিবন্-এব মতো আইবিশবা নিজেদেব মূর্ত্তি বাস্তব-জীবনেব আব্‌শিতে প্রতিফলিত দেখে উৎক্ষিপ্ত হ'যে ওঠেনি কী? কিন্তু আব্‌শি ভাঙ্‌তে চাইলেই কি কখনও প্রতিফলিত রূপ বদলায ?

লণ্ডনে যখন ও'কেইসীব নাটক তু'খানি প্রথম অভিনীত হোলে, তখন অবিশ্যি কোনো গোলমালই হয নি। কেনই বা হবে ? শ্যন্ ও'কেইসীব ধবণেব নাট্যকাবেব জন্ম ইংল্যাণ্ডে হয না—হ'তেও পাবেনা। আজ পর্য্যন্ত ও'কেইসী ব্যক্তি বা দল-বিশেষেব মন-বক্ষা কব্‌বাব জন্য নাটক লেখেন নি—লিখ্‌বেন বলে-ও বিশ্বাস কবি নে। এমনকি, এত অল্পদিনেব মধ্যে দেশে ও বিদেশে তাঁব নাটক এম্‌নি ভাবে লোকেব এতটা মনোবঞ্জন কব্‌বে, তা ও'কেইসী নিজেও বোধহয় কল্পনা কব্‌তে পাবেন নি।

অতি আশ্চর্য্যেব বিষয এই যে, ও'কেইসীব নাটকে যতটুকু সৌন্দর্য্য ও শালীন্য বযেচে, তাব প্রায় সবটুকুই তিনি তাঁর নারীচবিত্রগুলিব ভেতবেই ফুটিয়ে তুলেচেন;

তাঁর জুনো ও ব্যেসি-র মতো মেয়েরা পুরুষদের কদর্য্যতা, হীনতা ও অকর্ম্মণ্যতাকে অতিক্রম করে' নাটকের দারিদ্র্য-দগ্ধ জীবন-ধারার ওপরে রস-মাধুরীর নির্ঝর বইয়ে দিয়েচে। অথচ আয়ার্ল্যাণ্ডের মেয়েরাই ও'কেইসীকে অবুঝের মতো অপমান করতে কুণ্ঠিত হয় নি। সে-অপমান ও'কেইসীর গায়ে নিশ্চয়ই লাগে নি। কারণ, অতি অল্পদিনের ভেতরই আয়ার্ল্যাণ্ডের যথার্থ রস-সন্ধানী ও সাহিত্যামোদীরা ও'কেইসীকে অন্তর দিয়ে বরণ করে' নিয়েচেন, কারণ, তাঁরা বুঝেচেন যে, ও'কেইসী দুনিয়ার সাহিত্যের দরবারে আয়ার্ল্যাণ্ডের গৌরব কতখানি বাড়িয়েচেন। ও'কেইসী নবীন, নব-জাগ্রত আয়ার্ল্যাণ্ডের সত্যদ্রষ্টা, নির্ভীক সাহিত্যশিল্পী।

বিদেশী সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে কেউ-কেউ ও'কেইসীকে চেহভ্-এর সঙ্গে তুলনা করেচেন। যাঁরা ইয়োরোপীয় সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা জানেন যে, পরিকল্পনা ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে সেল্‌টিক্ সাহিত্যের সঙ্গে শ্লাভ্ সাহিত্যের যথেষ্ট মিল রয়েচে। অবিশ্যি মানব-জীবনের দুঃখ ও গ্লানি, এবং বস্তাবাহী ও দিনমজুরের অভাব ও দারিদ্র্যের চিত্র সকল দেশের সাহিত্যশিল্পীই অল্প-বিস্তর অঙ্কিত করে' গেছেন ও এখনও করছেন। কিন্তু ও'কেইসী ও চেহভ্-এর নাট্য-শিল্পের ভেতর যে-মিল রয়েচে, সেটা কেবল আখ্যানবস্তুর মিল নয়, সেটা মূলতঃ ও মুখ্যতঃ ভাব ও ভঙ্গীর।

যাঁরা চেহভের *The Cherry Orchard* অথবা *The Sea Gull* পড়েচেন, তাঁরা যদি ও'কেইসীর এই দু'খানা নাটক রচনা-ভঙ্গীর দিক দিয়ে তুলনা করে' দেখেন,

তা হ'লে সহজেই বুঝ্বেন যে, এঁদের কারুর নাটকেই তেমন কোনো একটি মামুলী ধরণের বাঁধাধরা প্লট্ নেই। যেন কতকগুলি আলাদা-আলাদা বাস্তব ও জীবন্ত ঘটনা আবদ্ধ হ'য়ে একটা নাটকীয় রূপ গ্রহণ করেচে। আপাততঃ দেখ্তে গেলে হয়তো মনে হবে যে, এর কোনো ঘটনাই তেমন জম্কালো নয়—তা ছাড়া, সেগুলো পরস্পর থেকে একটু বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, নাটকের ঘটনা-প্রবাহের গভীর প্রদেশে একটা অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য রয়েচে। এবং সেই জন্যেই ও'কেইসী ও চেহভের লিখবার কায়দা অনুরূপ এবং অন্য লেখকদের থেকে সম্পূর্ণ বিশিষ্ট বলে মনে হয়।

চরিত্র-অঙ্কনের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও এ-দু'জনের ভেতর খানিকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। দু'জনেই নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের ভেতরে একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুল্তে চেষ্টা করেচেন। বর্তমান যুগের নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই চরিত্র গড়তে গিয়ে প্রচলিত নাটুকে কুশীলব গড়ে' বসেন; কিন্তু চেহভ্ ও ও'কেইসীর মত মণীষা-সম্পন্ন আর্টিস্ট্দের বাহাদুরি এইখানে যে, তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি আমাদের চোখের সুমুখে একটা সম্পূর্ণ রূপ ও স্বাধীন সত্তা নিয়ে প্রতিভাত হয়। যদিও চেহভের 'Uncle Vanya' এক হিসাবে খাঁটি রাশ্যান্, যদিও 'Paycock' অতি বাস্তব রূপে আইরিশ্, তবুও তা'দের সুঃখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জয়-পরাজয়—সবই বিশ্বমানবের অনুভূতির অন্তর্গত।

আর, এঁরা দু'জনেই তাঁদের প্রায় সবগুলি চরিত্রকেই এম্নিভাবে তৈরী করেচেন যে, বাস্তব জীবনে যে-সামঞ্জস্য

ও সংঘাত, হর্ষ ও বিষাদ, সাফল্য ও নৈবাশ্য দিয়ে প্রতিদিন ছোট-বড কমেডি ও ট্র্যাজেডিব সৃষ্টি হচ্ছে, সে-সমস্তই তা'দেব মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। কাজেই, প্রচলিত মতে নাটকগুলি কমেডি কী ট্র্যাজেডি, তা ঠিক বোঝা যায না।

'জুনো'-ব দিক দিযে দেখ্‌তে গেলে *Juno and the Paycock* ট্র্যাজেডি, যেমনি তিন বোনেব তুর্ভাগ্যেব কথা ভাব্‌তে গেলে চেহহব্‌-এব *The Three Sisters* হ'যে পড়ে ট্র্যাজেডি। তবে, তফাৎ এই যে, 'জুনো'-ব জীবনে যে-তুঃখ-দৈন্য ঘট্‌ল, তাব ওপব তো তা'ব নিজেব কোনো হাত ছিল না, তার তুঃখেব কাবণ : এক দিকে স্বামীর ঠুন্‌কো বীবত্ব ও নিষ্কর্ম্মণ্যতা, অন্যদিকে নাটকে বর্ণিত আযার্ল্যাণ্ডেব বাজনৈতিক অবস্থা। কিন্তু চেহহ্বেব নাটকে তিন বোনেব ট্র্যাজেডি ঘট্‌ল তা'দেব নিজেদেবই মতিচ্ছন্নতা ও অস্থিবচিত্ততাব জন্যে ; তিন জনেবই জীবনেব মস্ত সাধ মস্কো-তে গিয়ে থাকা—বড শহবেব স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধে ভোগ কবা। কিন্তু কেন যে তা'বা জিনিষ-পত্তব গুছিযে মস্কো-ব ট্রেইনে চাপ্‌ছে না, সেইটেই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন ; দেখা গেল, নিজেদেব অব্যবস্থিতচিত্ততাব জন্যই তাবা পেবে উঠ্‌ছে না, কোনো দিন পাব্‌লোও না। এমন কি, নাট্যকার এ-ইঙ্গিত পর্য্যন্ত কবেছেন যে, যদি তারা কোনো দৈব উপাযে নিমেষেব মধ্যে মস্কো-তে গিয়ে উপস্থিত হ'তে পাব্‌তো, তা হলেও বোধ হয তাবা সুখী হ'তে পাব্‌তো না। আবাব হ্বেয়াব্‌শিনিন্‌-কে দিযে বিচার করতে হ'লে চেহহ্বেব এই নাটক কমেডি ; যেমন পেইকক্‌-এব দিক

দিযে ও'কেইসীর নাটক কমেডি হ'য়ে পড়ে। এদের বাদ দিলে ছুটোর একটা নাটক-ও দাঁড়াতে পাবে না।

চেহহব্ ও ও'কেইসী ছুজনেই খাঁটি বাস্তববাদী। তাই বলেই ছুনিয়ার যা-কিছু কুৎসিত তা এঁদেব চোখ এড়াতে পারে নি। তাঁদের ছু'জনেরই নাটকে বিশ্ব-মানবের চিরন্তনী আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হ'যে-হ'য়ে-ও উর্দ্ধমুখে চলেচে ; নিরাশার বেদনা জীবনের মাধুর্য্যকে নষ্ট করে' দেয নি। তাই, ও'কেইসী এ-কথাটাই স্পষ্ট করে' বোঝাতে চেষ্টা কবেছেন যে, আয়াল্যাণ্ড্ যে-ছুঃখের ভেতর দিযে চলে' এসেচে, সেটা বিশ্ব-মানবেব ছুঃখেরই অন্তর্গত, তাই, পেইককৃকে দিযে তিনি বলিয়েছেন,: "The worl's in a terrible state o'chassis".

আযাল্যাণ্ডের বেদনার ভেতব দিয়ে ও'কেইসী বিশ্বেব বেদনা বুঝ্তে পেবেছেন। চল্লিশ বছব ধবে' ছুঃখেব আগুনে পুড়ে'-পুড়ে' তাঁব হৃদয় হয়েচে সাচ্চা সোনা, তাই সোনায় সোনা ফলেচে।

রীতিমতো নাটক

শনিবার: লণ্ডনের কুয়াশা-ক্লিষ্ট সন্ধ্যা। বাইরে টিপ্‌টিপ্ করে' বৃষ্টি পড়্‌চে: নিউ অক্সফোর্ড থিয়েটার থেকে ম্যাটিনে-র পালা দেখে দলে-দলে মেয়ে-পুরুষ বেরিয়ে আস্‌চে।

থিয়েটারের ভেতরেও ভিড় জমেচে; সিঁড়ির গোড়াতে, দরজার পাশে, ব্যাল্‌কনির তলে, সর্ব্বত্রই লোকজন জড় হ'যে রয়েচে। লণ্ডনের থিয়েটারে ভিড় অবশ্য সর্ব্বদাই আছে; কিন্তু নিউ অক্স্‌ফোর্ড থিয়েটারের মতো একটা অল্প-নামকরা থিয়েটার নিয়ে তখন লণ্ডনে যতটা মাতামাতি চল্‌ছিল, তা একটা অভাবনীয় ঘটনাই বটে।

ব্যাপারটা ছিল এই: লুইজী পিরান্‌দেল্লো রোম থেকে তাঁর নিজের দল নিয়ে এসে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য লণ্ডনের এই থিয়েটারটি দখল করে' বসেচেন। তাঁর দুঃসাহস এই যে, ইংরেজীভাষীদের সাম্‌নে একেবারে নির্জ্জলা ইতালিয়ান্-এ তাঁর কয়েকখানা নাটক দেখাবেন। ইংরেজ জাতটা মোটেই ভাষাবিদ্ নয়, এ-কথাটা ইংরেজরাই গর্ব্বের সঙ্গে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। এর ভেতরে সৎসাহস বেশি থাকলেও সঙ্কীর্ণতা ও দাম্ভিকতা কম নেই। অথচ, ইতালিয়ান্ নাটক ইংরিজিতে না শুনে' ইতালিয়ানে শোনবার জন্যে লণ্ডনবাসীদের এত ঔৎসুক্য হোলো কেন? তার মানে, পিরান্‌দেল্লো ইদানীং ইয়োরোপের নাট্য-জগতে একটা

যুগান্তর এনেচেন। তাঁর নাট্য ভালো ক'রে বোঝ্‌বার ক্ষমতা খুব কম লোকের থাক্‌লেও, তাঁকে সশরীরে দেখা ও তাঁরই নিজের দল দিয়ে অভিনীত নাটক উপভোগ কর্‌বার মতো লোভ সম্বরণ করা অনেকের পক্ষেই তখন নিতান্ত সহজ হ'য়ে উঠে নি।

যারা এর আগে পিরানদেল্লোর লেখা নাটক ক'খানার ইংরেজী সংস্করণ পড়বার সুযোগ পেয়েছিল, তাদের অনেকেরই মনে বোধ হয় তখন এই প্রশ্নটা জেগেছিল: এই ধরণের নাটক বাস্তবিক কী-ভাবে অভিনীত হওয়া সম্ভব?

যে-শনিবারের কথা বল্‌চি, সেদিন পিরান্‌দেল্লোর সব চেয়ে নাম-করা নাটক *Six Characters in Search of an Author*-এর পালা ছিল। এই নাট্যের প্লট্‌টা বড়ই অদ্ভুত। ছয়টি নাটকীয় পাত্র-পাত্রী নাট্যকারের কাছে এসে বল্‌চে: "ওগো, আমাদের প্রাণ দাও, আমাদের জীবন্ত করে' তোলো। তোমায় অবিশ্যি শোনাবো আমাদের প্রত্যেকের জীবন-সংগ্রামের কথা, হাসি-কান্না, ভালো-মন্দ, আমাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রার সত্য কাহিনী, তবে একে ভাষা দিয়ে, ভাব দিয়ে, রহস্য দিয়ে, কৌতুক দিয়ে, হাস্য দিয়ে নাটকের রূপ দাও তুমি।" যখন এই কল্পিত ছয়টি কুশীলব রঙ্গমঞ্চে এসে উপস্থিত হ'য়েচে, তখন সেখানে আর-একটা নাটকের মহলা চল্‌চে। এই হচ্চে নাটকের মূল ঘটনা।

এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে' পিরান্‌দেল্লো এক বিচিত্র ব্যাপারের সৃষ্টি ক'রেচেন। তার ভেতর সবই আছে— প্রহসন আছে, ব্যঙ্গ আছে, দার্শনিক আলোচনা আছে; দুঃখের কারুণ্য আছে, আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে, প্রেমের

কৌতুকচিত্র আছে ; নাট্য-রচনার ওপর সুস্পষ্ট বিদ্রূপ আছে, আর আছে, বর্ত্তমান নারী-পুরুষের অবৈধ ভালোবাসার নক্সা। একখানি নাটকের ভিতর এত বিভিন্ন ধরণের ভাব, এত বিভিন্ন ধরণের অবস্থা, এত বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র-বিশ্লেষণ এবং এত পরস্পর-বিরোধী চিন্তা-স্রোতের সংঘাত কোনো দেশের কোনো সময়ের নাট্য-সাহিত্যে খুব কমই দেখ্‌তে পাওয়া গেছে।

এই নাটকের সব কথার পেছনে পিরান্‌দেল্লোর একটা কথাই সুস্পষ্ট হ'যে উঠেচে, যা'কে আমরা বাহ্যিক বাস্তবতা ও অন্তর্নিহিত তথ্যের ভেতরে পার্থক্য বলে মনে করি : আমরা চোখে যা দেখ্‌চি, তা সত্য নয়, আমরা নিজেরা নিজেদের সম্বন্ধে যা ভাব্‌চি ও আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের লোক আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে যা ভাব্‌চে, তার ভেতরে যে তফাৎ রয়েচে তাই পিরান্‌দেল্লো বোঝাতে চেষ্টা করেচেন।

কবি, নাট্যকার, উপন্যাস-লেখক, প্রত্যেক আর্টিস্‌ট্ই কল্পনার সাহায্যে যে-সব চরিত্র সৃষ্টি কর্‌চেন, তারা যদি একদিন হঠাৎ রূপ নিয়ে, মূর্ত্তি নিযে, রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ হ'য়ে, তাঁদের সুমুখে এসে দাঁড়িযে প্রত্যেকে বল্‌তো "অযমহং ভো", তখন যে-রহস্য ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হোতো, সেই রহস্য ও বিস্ময়েরই একটা নিখুঁত চিত্র পিরান্‌দেল্লো *Six Characters in Search of an Author*-এ এঁকেছেন।

আমরা জানি, প্রত্যেকের ভেতরে দু'টো বিভিন্ন রকমের মানুষ রয়েচে ; একটা তা'র আসল মানুষ, আর একটা তা'র আবরণে-ঢাকা, পোষাক-পরিচ্ছদে-ঘেরা একটা আলাদা ধরণের মানুষ। মানুষের ভেতরে এই যে দ্বি-ব্যক্তিত্ব ও

তা'র সুপ্ত ও জাগ্রত রূপ এবং তারই রূপান্তর, তা এতকাল দর্শন শাস্ত্রেরই অন্তর্গত ছিল। পিরান্‌দেল্লো একে রস-সাহিত্যে প্রকাশ করতে গিয়ে মৌলিকতারই পরিচয় দিয়েচেন বল্‌তে হবে। কাজেই, তাঁর সৃষ্টি সাধারণের চোখে যে খানিকটা অদ্ভুত বা সৃষ্টিছাড়া ঠেক্‌বে, তা'তে আর সন্দেহ কী? ইব্‌সেন থেকে আরম্ভ করে' এতকাল নাট্য-সাহিত্যে যে বস্তুতন্ত্রতার যুগ চল্‌ছিল, পিরান্‌দেল্লোর 'গ্রোটেস্‌ক্‌' নাট্য-সাহিত্য তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

'গ্রোটেস্‌ক্‌' নাট্যের একটা ঐতিহাসিক দিক অবিশ্যি আছে। এর জন্ম হয় ইতালিতে, যুদ্ধাবসানের কয়েক বছর পরে। সবার আগে প্রথম এই 'গ্রোটেস্‌ক্‌' নাট্য নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছেন লুইজী কিয়ারেল্লী (Luigi Chiarelli)—তাঁর ঐ ধরণের একখানা নাটকের নাম *Mask and Face* (মুখ ও মুখোস)। তারপরে San Secondo, Antonelli ও Pirandello লিখ্‌তে সুরু করলেন। পিরান্‌দেল্লো নিজে প্রথমে ছোট গল্প লিখ্‌তেন, কিন্তু আস্তে আস্তে নাট্য রচনার দিকেই হোলো তাঁর ঝোঁক বেশী। 'গ্রোটেস্‌ক্‌' নাট্য লিখ্‌বার আগে সিসিলিয়ান্‌ কথ্যভাষায় তিনি চার খানা ছোট নাটিকাও লিখেছিলেন।

পিরান্‌দেল্লোর জন্ম সিসিলির জিরজেন্‌টি অঞ্চলে। তিনি জার্ম্মণির ব্যন্‌ ইউনিভারসিটিতে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। সন্দেহ নেই, সেই সময়ে জার্ম্মন্‌ দর্শন-শাস্ত্র নিয়ে খুব ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছিলেন, এবং তারই প্রভাব তাঁর 'গ্রোটেস্‌ক্‌' নাটকে খুব স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পেয়েচে।

১৯১৮ সন পর্য্যন্ত ইতালিতে ছোট গল্প-লেখক হিসাবেই

পিরান্দেল্লোর সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু ১৯৪১ সনে যবে থেকে প্রথম রোম্-এ *Six Characters* অভিনীত হয়, তাঁর নাম ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম অভিনয় রজনীতে রোমের থিয়েটারে একটা মস্ত হৈ-চৈ পড়েছিল; এবং অভিনয় নিয়ে বাক্-বিতণ্ডাও হ'য়েছিল প্রচুর। যারা পিরান্দেল্লোর ভক্ত, তারা তখন যেম্নি তাঁকে অতিরিক্ত প্রশংসা কর্তে ছাড়ে নি, তেম্নি আবার অন্যদিকে পিরান্দেল্লোর বিরুদ্ধ-বাদীরা গালা-গালিরও চূড়ান্ত করেছিল। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত ইয়োরোপ ও আমেরিকার এমন বড় শহর নেই, যেখানে পিরান্দেল্লোর নাটক অভিনীত না হোয়েচে।

দেখা গেল যে, *Six Characters* লিখ্বার আগেও দ্বি-ব্যক্তিত্বের সমস্যা নিয়ে পিরান্দেল্লো একখানা উপন্যাস লিখেছিলেন। সে-উপন্যাসের নাম *Il Fu' Mattias Pascal* (The Late Mathias Pascal). বইখানা অনেক দিক দিয়ে ষ্টীভ্ন্সনের *Dr. Jekyll and Mr Hyde*-এর মতো। পিরান্দেল্লো এই বইখানায় দ্বি-ব্যক্তিত্বের কথা ছাড়াও অবিশ্যি আর একটা কথা বল্তে চেয়েছেন। সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষ ক্রীড়নক, পুতুল, তা'র নিজের কোনো ইচ্ছা নেই, সে শুধু প্রেমের প্রতারণায়, অভাবের তাড়নায়, সমাজের শাসনের নিষ্পেষণে, দৈব-দুর্ঘটনার আবর্ত্তনে, জীবনপ্রবাহের উপর শৈবালের মতো ভেসে চলেচে; সে-স্রোত তার প্রতিরোধ কর্বার শক্তি নেই; তার আছে কেবল একটা অজানা, অজ্ঞাত, রহস্যময় শক্তির টানে চলা, কেবল চলা।

অবিশ্যি মেট্যর্লিঙ্ক্ এবং অন্যান্য রূপক-সাহিত্য-

শিল্পীদের লেখার ভেতরে এই পবিকল্পনাটি যথেষ্ট পরিমাণে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু, পিবান্‌দেল্লো ও রূপক-সাহিত্যিকদের ভেতবে তফাৎ এই যে, পিরান্‌দেল্লোর চবিত্র-সমাবেশ ও ঘটনা-সৃষ্টি অদ্ভুত, সৃষ্টিছাড়া—মেট্যব্‌লিঙ্ক-এব মতো মোটেই ভাব-রসাত্মক নয়। পিরান্‌দেল্লোর *Il Piacere dell' Onesta* (Pleasure of Respectability) এবং *Cose` e`, se vi Pare* (Right you are, If you think so)—এই দুইখানা নাট্যে দ্বি-ব্যক্তিত্বেব বিষযটা খুব উগ্রভাবেই ফুটে উঠেচে।

Cose e`, se vi pare নাটকেব অবগুণ্ঠিতা নাবী, সিঞনিযরা পন্‌ত্‌সা কে, তা'ব উত্তব পিরান্‌দোল্লা সিঞনিয়বা পন্‌ত্‌সা-ব মুখ দিযেই বলাচ্ছেন—

> Signora Ponza · "What ? The truth ? The truth is simply this : I am the daughter of Signora Frola, and I am the second wife of Signor Ponza. Yes, and for myself, I am nobody, I am nobody· ·
>
> "Ah, but no, madam, for youiself, you··· must be—either the one or the other."
>
> "Not at all, not at all, sir ! No, foi myself, I am · whoever you choose to have me."

পিবান্‌দোল্লা তাঁব সমস্ত 'গ্রোটেস্‌ক্‌' নাটকেই এই একটা প্রশ্নই বাববাব তুলেচেন : মানুষের সত্যিকাব "আমি" কী ? আমি নিজেকে যা ভাব্‌চি, সে-ই "আমি", না অন্য সবাই আমাব ভেতবে যে "আমি" দেখ্‌চে সেই-ই "আমি" ? পিরান্‌দোল্লোব বাহাদুরি হ'চ্চে এইখানে যে, এই দ্বি-

ব্যক্তিত্বের সমস্যা নিয়ে কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যা তিনি তাঁর নাটকে করতে চেষ্টা করেন নি, এই কথাই তিনি শুধু বলতে চেয়েছেন যে মানব-চরিত্রের ভেতরে সৃষ্টির অনন্তকাল থেকে এ সমস্যা রয়েছে এবং তা'র জীবনের প্রতিকর্ম্মে, প্রতি চিন্তায় সেটা প্রকাশ পাচ্ছে। অ্যারিস্‌টট্‌ল্ বলে' গিয়েছেন যে, সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাণ-কথাই হচ্চে—"illusion of higher reality," অর্থাৎ রূপরসগন্ধস্পর্শময় বিশ্বচরাচরের সত্য বা বাস্তবতার একটা স্বপ্ন গড়াই হ'চ্ছে সাহিত্যশিল্পের আদর্শ; তা না করতে পারলে নাটক বা কাব্য লেখা চলে না; আর লেখা যদিও চলে তো তা কাব্য বা নাটক হয় না।

পিরান্‌দেল্লো দার্শনিক ও চিন্তাশীল লেখক হ'লেও সুরসিক নাট্যশিল্পী। তাঁর সমস্ত নাটকই হাসির কলরোলে ঝঙ্কৃত: চোখের জল থাম্‌তে না থাম্‌তেই আনন্দের প্রবাহ বইতে সুরু করে। তাঁর লেখার ভেতরে তীব্র সমালোচনা, ঠাট্টা ও ব্যঙ্গোক্তি প্রচুর আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাতে তাঁর অনাবিল হাস্যরসধারা কখনো প্রতিহত হয় নি। কারণ, পিরান্‌দেল্লোর হাস্যকৌতুকের ভেতরে কটূক্তির কলঙ্ক নেই; তা'তে আছে নিছক আনন্দের অনুভূতি ও বিশ্বের সুখদুঃখের সঙ্গে প্রাণের গভীর সহানুভূতি। পিরান্‌দেল্লো দরদী রসিক।

পিরান্‌দেল্লো নিজেও একজন প্রতিভাশালী অভিনেতা। তাঁর দল তিনি নিজের হাতে গড়েচেন। তিনি দলের প্রত্যেককে নিজের মুখে পাঠ শেখান্ ও নাটকীয় সব ভাবভঙ্গী নিজে করে' দেখান্।

পিরানদেল্লো সম্বন্ধে একবার একটা গল্প শুনেছিলুম:

বোম্-এ যে-বাড়ীতে তিনি থাক্‌তেন, তারই সুমুখে একবার একটা নতুন বাড়ী উঠ্‌ছিল। বাড়ীটা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে; ছাদটা তৈরী হ'চ্চে। ও-বাড়ীর ছাদ থেকে পিরান্‌দেল্লোর পড়্‌বার ঘরটা দেখা যায়। একদিন বিকেলবেলা পিরান্‌দেল্লো আর্‌শির সুমুখে দাঁড়িয়ে তাঁর একখানা নতুন নাটকের খশ্‌ড়া নিজেই হাতমুখ নেড়ে, ভঙ্গী ক'রে পড়ছিলেন। পড়া শেষ ক'রে হঠাৎ জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লেন, তিন-চার জন রাজমিস্ত্রী হাঁ ক'রে তাঁরই ঘরের ভেতরের দিকে তাকিয়ে আছে। পিরান্‌দেল্লো তাদের দিকে চাইতেই তারা সরে গেল। পরে শুন্‌তে পাওয়া গেল, রাজমিস্ত্রীরা পুলিশে নাকি খবর দিয়েচে যে, রাস্তার ওধারের বাড়ীতে একটা নিরেট পাগল রাতদিন হাত-পা ছুঁড়্‌চে, আর নিজের মনে আবোল্-তাবোল্ কী সব বক্‌চে। এই খবরটা নাকি আজ পর্য্যন্ত পিরান্‌দেল্লো শোনেন নি।

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

১৯২৮-সালে সাহিত্যের নোবেল্‌-পুরস্কার পেয়েছিলেন ইতালির ঔপন্যাসিকা গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা (Grazia de Ledda). এ-কথা মানতেই হবে যে, ইতালীর আধুনিক বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের মতো দেলেদ্দার নাম ঘরে কিংবা বাইরে ততো সুপরিচিত নয়। সাধারণতঃ পিরান্‌দেল্লো বা দান্নুন্‌ৎসিয়োকেই ইংরেজীভাষাভাষীরা বেশী জানেন। কাজে-কাজেই দেলেদ্দা যখন নোবেল্‌-পুরস্কার পেলেন তখন সবাই একটু কৌতূহলী হ'য়েছিল বৈকি।

একজন লেখিকাকে এইভাবে সম্মানিত করাও এই প্রথম নয়; তিন বছর আগেও নরোয়েইজীয়ান্‌ ঔপন্যাসিকা সীগ্রিড্‌ উন্‌ট্‌সেট্‌ (Sigrid Undset) নোবেল্‌-পুরস্কার পেয়েছিলেন। উন্‌ট্‌সেটের বিখ্যাত ঔপন্যাস ক'খানা—*Contemporary Tales and Novels* এবং তিন ভল্যুমে সম্পূর্ণ *Kristin Larvransdatter*—১৯০৭ সাল থেকে ১৯২২ সালের ভেতর লেখা। উন্‌ট্‌সেটের কথা-সাহিত্যের বিশেষত্ব নারী-চরিত্রেরই বেশি বিশ্লেষণ। সাহিত্যে ও সমাজে নারীর স্থান ও ব্যক্তিত্ব এই নিয়েই উন্‌ট্‌সেট্‌ বেশী জল্পনা-কল্পনা ক'রেছেন, এই হিসেবে দেলেদ্দার সঙ্গে তাঁর কোনোই মিল নেই।

দেলেদ্দা শিশুকাল থেকেই সার্‌দিনিয়াদ্বীপ-বাসিনী। ঐ দ্বীপে তাঁর জন্ম—অতি দরিদ্র কৃষক পরিবারে। আশৈশব তাঁকে অর্থাভাব ও যথোপযুক্ত শিক্ষাভাবের ক্লেশ

ভোগ করতে হ'য়েচে। তা সত্ত্বেও তাঁর লেখা-পড়ার ওপর ঝোঁক বয়স-বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বেড়েই চলেছিল। সার্দিনিয়ার নরনারীর জীবন-ভরা দৈন্য এবং নিশ্চেষ্ট অবসন্নতার ছবি বরাবর তাঁকে একদিকে যেমন মর্ম্মাহত কোরেচে, অন্য দিকে তা-ই তাঁর প্রাণে স্বদেশ-প্রেমের শিখা জ্বালিয়েচে। দেশের প্রতি এই বুকভরা টানই প্রথম তাঁকে সাহিত্য-সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেচে।

তাই, তাঁর সমস্ত গল্প ও উপন্যাসের প্রচ্ছদপট সার্দিনিয়া; তাঁর সব বর্ণিতব্য বিষয় সার্দিনিয়া-বাসিন্দাদের সুখ-দুঃখ। সার্দিনিয়ার পাহাড়গুলি দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে যেন আকাশকে গ্রাস করতে চায়; সে-দ্বীপের নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা সেখানকার মানুষগুলির জীবন-ধারার ওপর যেন একটা উৎকট ও রুদ্র সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে দেয়ঃ তারা যেন সবাই একটা রহস্যময় ভাগ্যচক্রের পাকে প'ড়ে নিষ্পেষিত হ'য়ে হ'য়ে জীবনলীলা সাঙ্গ করে। এরাই হচ্চে দেলেদ্দার অধিকাংশ গল্পের পাত্র-পাত্রী।

সার্দিনিয়া ইতালীর অন্তর্গত হ'লেও ইতালীয়ানরা ও-দ্বীপের লোকদের বরাবর একটু অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখেই দেখে এসেচে। ইতালিয়ানদের এই আচরণ দেলেদ্দাকে সবসময়-ই কী নির্ম্মম আঘাত কোরেচে! তাই, সার্দিনিয়ার মর্ম্মকথা সমস্ত দুনিয়াকে জানিয়ে দেবেন, এই ছিল দেলেদ্দার প্রথম সাহিত্যিক জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। একরকম বলতে গেলে যখন তাঁর প্রথম বই *Cenere* (ছাই) বেরুলো, ইতালীয়ান্ সাহিত্যিকদের সার্দিনিয়ার দিকে প্রথম নজর পড়লো।

এই উপন্যাসের নায়ক এক সার্‌দিনিয়ান্‌ যুবক তার মা'কে খুঁজতে বেরিয়েছে, যদিও কে তার মা তা সে জানে না। জীবনের সমস্ত উদ্যম ও উৎসাহ, আর-সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়ে সে তার এই জন্ম-রহস্যোদ্ঘাটনেই নিয়োগ কোরেচে। যখন সে তার মা-কে খুঁজে পেলো, তখন সে পেলো কী নিষ্ঠুর মর্ম্মঘাতী আঘাত! দেখ্‌লে, তার মা ঘৃণিত পশুর মতো গ্রামের পথে-পথে ব্যাভিচারিণী হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবুও সে উদ্বেলিত মাতৃস্নেহের টানে মা-কে নিয়ে একটা বাড়ী ক'রে এক সঙ্গে থাকতে লাগ্‌ল। তার জীবন এমনি হ'য়ে যাবে সে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবে নি, তাই প্রতি মুহূর্ত্তে তার হৃদয়ের স্নেহ ও কর্ত্তব্যবোধ ছাপিয়ে উঠে' কেবলই তার মনে হোতো: মা মরে' গেলে বোধ হয় সে বাঁচে, দুনিয়াতে মানুষের মতো হ'য়ে সে আবার দাঁড়াতে পারে। মা-ই তো তার ভবিষ্যতের উন্নতির পথে অন্তরায় হোয়েচে। মা-ই অবশেষে অপঘাতিনী হোলো, কিন্তু ছেলেকে সমস্তটা জীবন জীবন্মৃত হ'য়ে পড়ে' রইতে হ'ল।

দেলেদ্দার দ্বিতীয় উপন্যাস 'লেদেরা'—*L'Edera* (আইভি-লতা) একটি সার্‌দিনিয়ান্‌ তরুণীর দুঃখপূর্ণ জীবন-কাহিনী। তরুণীটি পালিত কন্যা: যে-পরিবারের ভেতর সে মানুষ হোয়েচে, তাদের বৃদ্ধ ঠাকুর্‌দাকে সে একদিন রোগ-শয্যায় শায়িত অবস্থায় গলা টিপে' মেরে ফেল্‌লে। কেননা, এই বুড়ো মানুষটিই ছিল সমস্ত পরিবারের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ। এই পরিবারের সকলেই বুড়োর মৃত্যুতে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো, এবং সব জেনে-শুনে'ও কেউ মেয়েটিকে পুলিসে ধরিয়ে দিলে না। কিন্তু এ ঘটনার

পর থেকে মেয়েটির মনে আর শান্তি নেই। সে হঠাৎ একদিন বাড়ী ছেড়ে চলে' গেল, পাহাড়ে, জঙ্গলে, পাগলের মতো ঘুরতে লাগলো ; তার অনুতপ্ত, চঞ্চল মন কিছুতেই আর শান্ত হোতে চায় না।

এই পরিবারেরই একটি যুবককে মেয়েটি খুব ভালবাসতো—শেষে তারই টানে সে একদিন ঘরে ফিরে' এলো। ফিরে এসে দেখলো সেই পুরোনো, জীর্ণ-শীর্ণ গৃহ আগের মতোই আছে ; আর মানুষ-গুলোও বদলায় নি—আগের মতোই স্থাণু, স্থবির, অলস, অকর্ম্মণ্য। যে-ছেলেটিকে মেয়েটি ভালবাসতো, সে-ও দেনায় ও মদে জর্জ্জর হ'যে আছে, অসময়ে তার চুলে পাক ধরেচে।

'কান্নে আল্ ভেন্তো'—*Canne al vento* (হাওয়ার শাঁস) দেলেদ্দার সব চেয়ে দীর্ঘ উপন্যাস। এর নায়ক একজন সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী : সার্দিনিয়ার বীভৎস নীরবতা, আদিম মানুষের নির্ম্মম রুদ্রতার মতো এ-বইখানার পরতে-পরতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি চিত্র অত্যন্ত সাদাসিধে হ'লেও খুব সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। কিন্তু গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের কেবলই মনে হবে যেন একটা অশরীরীমায়া-জাল তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে চায়। বইটাতে আধিভৌতিক (supernatural) ভয়ের এক-একটা ছবি এত জীবন্ত ও হুবহু যে তার জুড়ী বোধ হয় *Ancient Mariner* বা *Castle of Otranto* ধরণের বইতেও পাওয়া যায় না।

আজ পর্য্যন্ত দেলেদ্দা যে-কয়খানা বই লিখেচেন, তা সবই মোটামুটি করুণরসাত্মক, কোনো চরিত্রের মুখেই হাসি নেই। দেলেদ্দার গল্পগুলিতে, সবাই যেন মরমে মরে' আছে :

তাদের চলা-ফেরা, ভাব-ভঙ্গী, আদব-কায়দা সবই সামঞ্জস্য-হীন, নিরর্থক। তারা যেন একটা অজানা, সৃষ্টিছাড়া বৃহৎ শক্তির টানে পড়ে' আপনাদের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হ'য়ে রয়েচে ; মনে হয়, তাদের জীবন-স্রোতের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কোন্ এক অনাদি কাল থেকে সেই বহুদিনের পুরোণো, দুর্ব্বোধ্য কঠিন পর্ব্বত-মালা ; তাদের জীবনগুলির গাঁটে-গাঁটে জড়িয়ে রয়েচে তাদের পুরুষানুক্রমিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা, আর সুমুখে পড়ে' আছে অজ্ঞেয় রহস্য ও অনন্ত দুঃখ।

নিজের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মতো দেলেদ্দার লিখন-ভঙ্গীও চোয়াড়ে ও চাঁছা-ছোলা। কিন্তু সাহিত্যে কাঠিন্যের-ও যে কী অনির্ব্বচনীয় সম্মোহিনী শক্তি থাকতে পারে, তা দেলেদ্দার লেখা পড়্‌লে বোঝা যায়।

দেলেদ্দার কথা বল্‌তে গিয়ে আর একজনের কথা মনে আসে : টমাস্ হার্ডি। হার্ডি দুঃখবাদী ব'লে নাকি তাঁকে নোবেল্-পুরস্কার দেয়া হয় নি, কিন্তু যে-হিসাবে হার্ডিকে দুঃখবাদী নাম দেয়া চলে, সে-হিসাবে দেলেদ্দাকেও তো তাই বলা যায়। হার্ডির বেদনা-ব্যঞ্জক দুঃখবাদ-নীতি দেলেদ্দাতে শুধু অন্যরূপে, অন্য ঢঙে প্রকাশ পেয়েছে, এই-টুকুই তফাৎ। অবিশ্যি হার্ডির সঙ্গে রসশিল্পী হিসাবে দেলেদ্দার কোন তুলনা-ই চলে না। হার্ডির লেখায় র'য়েছে মানবচরিত্রের নিখুঁত পরিবেশন—যা পড়্‌লে পাঠকের মন হাসি-কান্না, ক্ষয়ক্ষতির বাইরে চলে যায়। দেলেদ্দার করুণ চিত্রগুলি হৃদয় আহত করে, প্রাণে সমবেদনা জাগিয়ে তোলে, কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির

পরেও যে জিনিষটা রয়েচে, তার আভাস হার্ডি দিয়ে গেছেন।

কিছুদিন থেকে দেলেদ্দা সার্দিনিয়া ছেড়ে ইতালীতে এসে বাস কর্‌ছেন। সাহিত্য-জগতে আদর ও খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনধারা-ও শৈশবের দারিদ্র্য ও কুশ্রীতা থেকে মুক্ত হ'য়ে, পরে একটা বড় দুনিয়ার আলো বাতাস পেয়েচে, তাঁকে আর নির্জ্জন দ্বীপের সেই একটানা নিঃসঙ্গতা সইতে হ'চ্ছে না। শোনা যায় তিনি নাকি সার্দিনিয়া সম্পর্কিত আর কোনো গল্প কোনোদিন লিখবেন না। কেন? তাঁর একটা নূতন উপন্যাস *Fiore della Vita* (জীবন-ফুল) তার একটু আভাসও দিয়েচে। গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা সার্দিনিয়াকে একেবারে ভুলে' যেতে চেষ্টা করছেন না তো?

"উইলিয়্যম্ ক্লিসোল্ড্"

এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌-এর *The World of William Clissold* (উইলিয়্যম্ ক্লিসোল্‌ডের জগৎ) যখন প্রথম ইংল্যাণ্ডে পর-পর তিন কিস্তিতে, আর আমেরিকাতে দু'বারে দু'খণ্ডে বেরুল তখন ঐ বইটা নিয়ে চারিদিকে একটা ভীষণ সোরগোল পড়েছিল। অনেক বছর আগের কথা লিখ্‌ছি—যখন অ্যালেক্‌জাণ্ডার কর্ডা-র নাম কেউ শোনেনি, বা *Things to Come*-এর বাণী-চিত্র পর্দ্দার গায়ে দেখবার মতো দুঃস্বপ্ন-ও কেউ দেখেনি। ক্লিসোল্‌ডের আবির্ভাবের পর অনেক কিছুই ঘট্‌চে, অনেক কিছুই ঘটেবে ব'লে ওয়েল্‌স্ আশঙ্কা করেছেন, কিন্তু ক্লিসোল্‌ড্‌কে তো ভোলা যায় না।

"উইলিয়্যম্ ক্লিসোল্ড্" ওয়েল্‌সের উদ্ভাবনী শক্তির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি—সব দিক দিয়েই অপূর্ব্ব। বইটা আয়তনে যেমন সুদীর্ঘ, তেম্‌নি বস্তু-সম্ভারেও জমাট্ ও ভরপুর। যাঁরা কেবল কালক্ষেপ কর্‌বার জন্য উপন্যাস পড়েন, তাঁরা বইখানা পড়ে' যে খুব বেশী আরাম পাবেন তা মনে হয় না; আর যাঁরা কেবল ক্ষণিক, হাল্কা আরাম পাবার জন্য উপন্যাস পড়েন তাঁদেরও পদে-পদে আরামের ব্যাঘাত হবে, তা নিঃসন্দেহে বলে রাখছি।

ওয়েল্‌স্ "উইলিয়্যম্ ক্লিসোল্ড্"-এর জীবনীর ভেতর দিয়ে যে বিরাট্ জগৎ রচনা করেছেন, সেটা শুধু তার বাইরের জগৎ নয়, কেবল ক্লিসোল্‌ডের দৈহিক অস্তিত্বের কাহিনীও নয়; সেটা ক্লিসোল্‌ডের মনোজগতেরই একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ

ইতিহাস। সেই হিসাবে বইখানাকে ক্লিসোল্‌ডের মানসিক আত্ম-জীবনী বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না।

আর, ক্লিসোল্‌ডের মনোজগতটা কেবল একটা কবির স্বপ্ন দিয়ে-ও তৈরী হয় নি ; তাতে দুনিযাব অর্থ-নৈতিক, আত্মিক ও ষড়িন্দ্রিয সম্পর্কীয় সমস্যার সঙ্গে ক্লিসোল্‌ডের চিন্তা-ধাবা খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংলিপ্ত হ'যে বয়েচে। কাজেই, ক্লিসোল্‌ডেব এই অপূর্ব্ব কল্পজগতকে খুব ভালো ক'রে চিন্‌তে হ'লে যথেষ্ট ধৈর্য্যেব দরকার তো হবেই, তাব চেযে বেশি দর্‌কার হবে মনেব মেহানত। এ-মেহানত খুব ক্লেশকর হবে না, সে আশ্বাস অবিশ্যি দিতে পারি ; কিন্তু তা থেকে মনের ভেতবে যে একটা বিপুল আলোডনেব সৃষ্টি হবেনা, তা জোব ক'রে বলা সম্ভব নয।

কিন্তু আর সবাইকে ছেড়ে, ক্লিসোল্‌ডেব কথাই বা বলা কেন ? এই জন্য যে, আজ পর্য্যন্ত ওযেল্‌স্ তাঁর যতগুলি "মাউথ্‌পীস্" বানিয়ে শেষ কবেচেন তাব ভেতর ক্লিসোল্‌ড্ চবিত্রেব মনেব চেহাবাটারই সঙ্গে তাঁর নিজের মনেব চেহাবাটাব বেশী অদল দেখ্‌তে পাওয়া যায। ওয়েল্‌সের মতো মানুষটাকে বুঝে দেখা বোধহয় উচিত, এবং তা ক্লিসোল্‌ডেব প্রতিচ্ছবিকে সামনে বেখে দেখাই ভালো। ওযেল্‌সের বঙীন ফানুষেব ফাটা-ফাটি আব দেখ্‌তে ভালো লাগে না।

ঔপন্যাসিক হিসাবে বাজাবে ওযেল্‌সেব একটা দুর্নাম বটে' গেছে : তিনি নাকি কেবলি নিজেব কথা, নিজের মতা-মত তাঁর লেখাব ভেতর দিয়ে বলেন, আব তাঁব সৃষ্ট চরিত্র-গুলিও নাকি তাঁবই ব্যক্তিগত জীবনেব অভিজ্ঞতাব ছাঁচে

ঢালাই-করা। কাজেই 'উইলিয়াম্ ক্লিসোল্ড্' লিখে আবার নূতন ক'রে সে-বদ্‌নামের ভাগী না হোতে হয়, সেই জন্যে গোড়াতেই তিনি বইটার সঙ্গে একটা নাতিদীর্ঘ ভূমিকা জুড়ে' দিয়েছেন এবং তাতে স্পষ্ট ক'রে লিখে দিয়েছেন: ক্লিসোল্‌ড ও ওয়েল্‌স্ এ দুটি ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র।

> "William Clissold is a fictitious character...It would be a great kindness to a no doubt undeserving author if, in this instance, William Clissold could be treated as William Clissold."

আবেদন নামঞ্জুর। বইখানা আদ্যোপান্ত প'ড়ে দেখ্‌লে ক্লিসোল্ড্ ও ওয়েল্‌স্‌কে একই ব্যক্তি বলে' প্রতিপন্ন করা হয়তো পাগ্‌লামিই হবে, কিন্তু ক্লিসোল্ড্ ব্যক্তিটি যে ওয়েল্‌সের মেগাফোন্ ছাড়া আর কী হোতে পারে তা-ও তো ভেবে পাচ্ছিনে। বইখানিতে একাধিক বার বলাও হোয়েচে যে, ওয়েল্‌স্ ক্লিসোল্ডের দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয়। কাজেই ক্লিসোল্ড্ যখন তাঁর আত্মীয়, ও তার ওপরে ওয়েল্‌সের মতো একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের বই অনেক পড়েছে, তখন ক্লিসোল্ডের চিন্তা-জগতের ওপর বর্ত্তমান যুগের খ্যাতনামা লেখকদের ভেতর ওয়েল্‌সের চিন্তাধারার-ই প্রভাব যে বেশী পড়েছে, এ-কথা মনে ক'রলে ওয়েল্‌সের উপর কোনই অবিচার করা হবে না।

উইলিয়াম্ ক্লিসোল্ড্ বিংশ শতাব্দীর নব্য ধরণের উদারপন্থী-যুগের মানুষ। জীবনের বৃহদংশ মাইনিং ও এন্‌জিনিয়ারিং ব্যবসায় অজস্র অর্থ সঞ্চয় ক'রে, ষাট্ বছর বয়সে নিজের জীবনকাহিনী লিখ্‌তে বসেছে: রিভিয়েরার

উপকূলে প্রভঁসের অনতিদূরবর্ত্তী একটা পাহাড়ে জায়গার ওপরে, *Villa Jasmin*-তে বসে, স্বচ্ছন্দ আলস্যে, ক্লিসোল্‌ড্‌ নিজের কথা ভাব্‌ছে, আর লিখ্‌ছে।

ক্লিসোল্‌ডের পেছনে পড়ে' রয়েছে ষাট্‌ বছরের কর্ম্মবহুল জীবন, আর সঙ্গে রয়েছে জীবনের শেষ প্রণয়িনী ক্লেমেন্তিনা। তার চোখের সুমুখে কৈশোরের চঞ্চল আনন্দ-লীলা, যৌবনের উদ্দাম লালসার ঝঞ্ঝাবাত, আর প্রৌঢকালের পরিণত চিন্তা-প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাত ছায়া-বাজীর মতো একটার পর একটা ভেসে চলেছে। ওয়েল্‌স্‌ ক্লিসোল্‌ডের চিন্তা-প্রবাহের গতিকে বিশ্ব-মানব-মনের গতির রূপক ক'রে বইখানার মর্ম্ম-কথা ব্যক্ত করেছেন একটা গ্রীক্‌ উদ্ধৃতিতে: "All things flow": দুনিয়ার প্রবাহ চল্‌ছে, স্রোতের মতো চল্‌ছে, সুন্দরের যাত্রায়, প্রেয-র খোঁজে।

ক্লিসোল্‌ডের বিশ্বাস: সৃষ্টির আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত দুনিয়াটা ভালোর দিকেই চলেছে, মানুষ বড় হ'য়ে হ'য়ে ক্রমেই অগ্রসর হোচ্ছে। ক্লিসোল্‌ড্‌ তাই মর্‌বার আগে সভ্যজগৎকে জানিয়ে যেতে চাচ্ছে, নিজের জীবনের আদ্যো-পান্ত কাহিনী: মনের কাহিনী, দেহের কাহিনী। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছে, কী উপায়ে মানব-জাতির অধিকতর কল্যাণ ও সুখ-সাধন করা যায়।

এই খানেই আমরা ক্লিসোল্‌ডের ভাব-জগতের সঙ্গে তার বহির্জ্জগতের যোগসূত্র এবং সেই সঙ্গে, ওয়েল্‌সের নিজস্ব চিন্তাধারার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি খুঁজে পাই। স্বীকার করি, ক্লিসোল্‌ডের জীবনে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে, তা সবই

ওয়েল্‌সের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়; তাতে এই বিংশ শতাব্দীর মানব-সমাজের বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলিই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে র'য়েচে। এ কথা তো ওয়েল্‌সের নিজের সম্বন্ধে হুবহু খাটে।

মানুষের জ্ঞাতব্য ও জ্ঞাত এমন অল্প বিষয়ই আছে, যা নিয়ে ওয়েল্‌স্ নাড়াচাড়া করেন নি: বায়্-অ-লজি, মিনের্-অ-লজি, ব্যাঙ্কিং থেকে সুরু ক'রে সাইকো-অ্যানালিসিস্, ইউজেনিক্‌স্, সোশ্যালিজ্‌ম্, থিয়্-অ-লজি পর্য্যন্ত এ-দুনিয়ার কোনো কথা নিয়েই ক্লিসোল্‌ড্, অর্থাৎ ওয়েল্‌স্, বিশদভাবে আলোচনা করতে কসুর করে নি।

আলোচ্য বিষয়গুলি দুরূহ ও সমস্যামূলক হ'লেও এ-কাহিনীর পাতায়-পাতায় একটা সরস আন্তরিকতা ও সুগভীর রসানুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে। সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত নারী-পুরুষের সম্বন্ধ-নির্ণয় নিয়ে যে-সব সমস্যা মানব-মনকে আলোড়িত করছে, তার কারণ ও স্বরূপ ক্লিসোল্‌ডের প্রণয়ের উপাখ্যানগুলিতে, বিশেষ ক'রে, অতি সুন্দর ভাবে ফুটে' উঠেছে।

এই ধরণের বই ঠিক উপন্যাস-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নিয়ে অবিশ্যি একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। লেখক নিজেই ভূমিকাতে বলছেন: বইখানা সর্ব্বতোভাবে উপন্যাস এবং উপন্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। বই'র সুবিশাল কলেবর, ঘটনার অফুরন্ত বৈচিত্র্য, এবং আলোচনার অপরিমেয় বহর দেখে একে উপন্যাস ব'লে মেনে নিতে গররাজী হওয়া স্বাভাবিক। অবিশ্যি বলি নে যে, উপন্যাস মাত্রেরই বস্তু ও ঘটনা সম্বন্ধে কোনো একটা বাঁধা-ধরা আইন্ মেনে চলতে

হবে; কিন্তু এ-কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে উপন্যাস কথা-সাহিত্য, কথকতা নয়।

ওয়েল্‌স্-এর ক্লিসোল্ড্ অবিশ্যি একজন ওস্তাদ কথক। তার কথার শেষ নেই, অনর্গল বকে' যাচ্ছে, তবে কথাগুলি এত রসাল ও চিত্তাকর্ষক যে, না শুনে' উপায়ও নেই, পরিত্রাণ-ও নেই। ক্লিসোল্‌ডের সমস্ত উক্তির পেছনেই যুক্তি আছে, স্বীকার করি, আর যুক্তিকে সুদৃঢ় কর্‌বার জন্যে ক্লিসোল্ড্, অর্থাৎ ওয়েল্‌স্, কী অশেষ মানসিক কস্‌রৎই না করেছেন!

কখনো বর্ত্তমান যুগের জীবন-সমস্যাকে আক্রমণ ক'রে, কখনো অতীতের জীবন-ধারাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে, আর কখনো-বা বিশ্ব-মানবের ভবিষ্যতের চেহারা এঁকে, ক্লিসোল্ড্ তাঁর যুক্তিগুলিকে পোক্ত ক'রে তুলেছে, কখনো সফল হয়েছে, কখনো হয় নি। এ বোধ করি ওয়েল্‌সেরই সাহিত্যিক জীবনের লাভ-লোকসানের খতিয়ানের কথা।

বইখানার গল্পাংশটুকু বজায় রেখে আলোচনার অংশ ছেঁটে কমিয়ে দিলে এখানি একখানা প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস হয়তো হোতে পার্‌তো; তবে পুরোপুরি উপন্যাস হয়নি বলে' তেমন বিশেষ ক্ষতি হয়নি। অন্তত বইটা কথাকাব্য তো হয়েছে। কাব্য বল্‌ছি এই হিসেবে যে, গুরু-গম্ভীর জটিল বিষয়ের বেশি বিশ্লেষণ থাকা সত্ত্বেও বইখানা আগাগোড়া রসাত্মক বাক্যে জমাট। এমনকি, প্রত্যেক পরিচ্ছেদের নামকরণগুলি পর্য্যন্ত পোয়েটিক্: এখানে মাত্র দু'চারটার নাম ক'র্‌বো: 'The Frame of the Picture'; 'Life Radiates'; 'The Immortal Adventure';

'Venus as an Evening Star.' দার্শনিক, চিন্তাশীল ওয়েল্‌স্‌ যে একটু বেশী মাত্রায় রোমাণ্টিক্‌ সে কথা তো আর কারুর অজানা নেই। বইখানা এত রসাল হওয়ার দরুণই বোধ হয় ক্লিসোল্‌ডের অফুরন্ত যুক্তি-তর্ক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চা খানিকটা সহনীয় হোয়েচে।

একটা ভরসার কথা এই যে, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য ক্লিসোল্‌ড্‌ যে নূতন জগতের কল্পনা করেছে, সে-জগতের বাসিন্দারা বর্ত্তমান যুগের উৎপীড়িত, দারিদ্র্যগ্রস্ত নর-নারীদের মতো এত কষ্ট পাবে না। এই কষ্ট নিবারণ কর্‌বার জন্যে ক্লিসোল্‌ড্‌ তিনটি উপায় বিশেষভাবে উল্লেখ কোরেচে, ও সেগুলি বিশ্লেষণ কোরে-ও দেখিয়েচে ঃ প্রথমতঃ, মানুষকে তার সঙ্কীর্ণ, ব্যক্তিগত জীবনকে সমগ্র মানব-জাতির জীবনের মধ্যে লুপ্ত ক'রে দিতে হবে; তার সুখদুঃখ, সাফল্য, নিস্ফলতা, ভালোমন্দ—সব-কিছুই বিশ্বের শুভা-শুভের পরিমাণ দিয়ে তাকে বিচার কর্‌তে হবে। দ্বিতীয়তঃ, এ-যুগের সভ্যতার সঙ্গে মানুষের টাকা পয়সার লেনা-দেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য আরো উদার ভাবে চালাতে হবে। তৃতীয়তঃ, কার্ল্‌ মার্কস্‌ প্রবর্ত্তিত সোশ্যালিজ্‌ম্‌ দিয়ে মানব জাতির যথার্থ মুক্তি কোনো দিনও হবে না ঃ আজকের দিনে বড় বড় ব্যাংকার্‌ ও ইন্‌ড্রাস্‌ট্রিয়ালিষ্ট্‌দের হাতে যে-অসীম ক্ষমতা রয়েছে, তারা ইচ্ছে কর্‌লেই সে-ক্ষমতার সদ্ব্যবহার ক'রে দু'দিনেই দুনিয়ার চেহারা বদ্‌লে দিতে পারে; দুঃখের বিষয়, আজও তারা এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হ'য়ে ওঠে নি। কাজেই, দুনিয়ার পুনর্গঠনের জন্য সকলের আগে তাদের সবাইকে ডেকে সঙ্গে নিতে হবে;

তাদের সচেতন করতে পারবে কেবল তারা-ই যারা ক্লিসোল্ডের মতো উদারপন্থী বিশ্বহিতৈষী। তারা হবে বিপ্লব-পন্থী, কিন্তু তাদের এই বিপ্লব-বাদের ভেতর কম্যুনিজম্-এর কোনো গন্ধ থাকবে না।

ক্লিসোল্ড্ এ বিপ্লবপন্থার নাম দিয়েছে "প্রকাশ্য চক্রান্ত" (Open Conspiracy); তারা রাজা ও রাজ্যকে বিনাশ করবে না; তারা গড়ে' তুলবে নব-নব অনুষ্ঠান, কাজ করবে নব-নব কর্ম্ম-প্রণালীতে; এবং তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে পোকায়-ধরা, মরচে-পড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুশাসন ও অনুষ্ঠান একে-একে ভেঙে পড়বে।

ক্লিসোল্ডের মুখ-দিয়ে-বকানো জগত-প্রাণীর এই মুক্তি-প্রয়াসের ব্যবস্থা ও কর্ম্মপদ্ধতি ওয়েল্সের নিজের অসংখ্য উক্তিরই রকমফের ছাড়া আর কী হোতে পারে? ক্লিসোল্-ডের মতে অনুসৃত সেই বিশ্ব-বিপ্লবটা যদি সফল হয় তবে জাতির সঙ্গে জাতির লড়াই বাঁধবে না, রেষারেষি থাকবে না—সব দেশ, সব জাতি একটা বিশ্বজাতি-সংঘের অধীনে এসে পড়বে: তখন সমাজ ও রাষ্ট্র দুই-ই সম্পূর্ণ সাবালক অবস্থায় এসে পৌঁছুবে। ক্লিসোল্ড্ এ-অবস্থার নাম দিয়েছে 'মানব-জাতির খোলস্-বদল'। ক্লিসোল্ডের বিশ্বাস, তার এই নব-জগতের স্বপ্ন ফলবার আর বেশি বাকী নেই।

সন্দেহ নেই, মানব-জগতের সিদ্ধি-লাভের জন্য যে-পথ ক্লিসোল্ড্ নির্দ্দেশ করেছে, সেটা ওয়েল্সের-ই নির্দ্ধারিত পথ। নইলে, ষাট্ বছরের বুড়ো বিলি ক্লিসোল্ড্ সারাটা জীবন এন্‌জিনিয়ারিং ব্যবসায়ে কাটিয়ে দিয়ে, ব্যর্থ-হৃদয়ে

নিজের জীবন-কাহিনীকেই মানদণ্ড ক'রে এত বড় দুনিয়ার পুনর্গঠনের জন্য এমন অপূর্ব্ব বিধি-ব্যবস্থা কী ক'রে করলে, তা ভেবে অবাক্ হ'যে যেতে হয় !

যা হোক্, যদি ক্লিসোল্ডের ভবিষ্যৎ-জগতের স্বপ্ন সমগ্র মানবের মঙ্গল ও ঋদ্ধিলাভে কিছুমাত্র সাহায্য করে, তবে ক্লিসোল্ডের বাহাদুরিকে বাহবা না দিয়ে আর পারা যাবে না। কিন্তু, যদি তার স্বপ্ন সফল না হয়, তবে ক্লিসোল্ড্‌কে সন্দীপ ও সব্যসাচীর সহোদর, না হয় সতীর্থ ব'লে ভবিষ্যতে অনেক লাঞ্ছনাই সইতে হবে। তবে ভরসা এই, তেষট্টি বছর পরে, অর্থাৎ দু'হাজার খৃষ্ট-অব্দে, এ-দুনিয়ার বাসিন্দারা ক্লিসোল্ড্‌কে হয়তো ভুলে' যাবে, কিন্তু ওয়েলস্‌কে কেউ কেউ মনে রাখতে পারে-ও বা।

গীত-নাট্য

ছোট্ট গ্রাম : দেশ্‌লাইয়ের বাক্সের মতো। সুনীল সাগর শত ধারায় এগিয়ে এসে সেখানে মাটির ভেতর আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না : পূর্ণিমার নিশীথ রাত্রি। আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে আমরা জাপানের 'এনিযো' মহোৎসব দেখ্‌তে চলেছি। নগরের কোলাহল একটু-একটু ক'রে মিলিয়ে যাচ্ছে। পথের দু'ধারে তারার মালার মতো কাগজের লণ্ঠন মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে। যেদিকে তাকাই, লোকারণ্য।

দোকান-পাট অসংখ্য সৌখীন জিনিষে পরিপাটি ক'রে সাজানো। রেস্তোরাঁ গুলোর সুমুখের আঙিনায় ব'সে, খোলা চুলোর চারদিক ঘিরে, জাপানীরা কাঁক্‌ড়া ও গল্‌দা-চিংড়ি-ভাজা খাচ্ছে। আশে-পাশের বাড়ির ভেতরে মেয়েদের সিল্‌য়েত্‌ আর প্রজাপতির পাখার মতো খোঁপাগুলো দেখা যাচ্ছে।

মন্দিরের সাম্‌নে পৌঁছ্‌তে না পৌঁছ্‌তেই চোখে পড়্‌লো, কতকগুলো তাবু; সেগুলির চারদিকে, নাগর-দোলার ঘূর্ণমান খেলার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে অসংখ্য ছেলেমেয়েরা কোলাহল লাগিয়েছে, স্যর্কাসের খেলা দেখ্‌তে জটলা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। একরাশ লোক উঁচু মন্দিরের অসংখ্য সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌চে। কানে এলো অস্পষ্ট অথচ জোরালো সুরে সুরমেলানো স্তোত্রগান—হুসা, হুসা, হুসা।

শুনেই মনে হোলো, প্রাচীন স্পার্টার তরুণীদের

ডিয়নিসাসের বসন্ত-উৎসব। সে-রজনীতে অ্যাপোলোর কাঞ্চন-সিংহাসনেব সুমুখে এম্‌নি ক'রেই বোধ হয় সুন্দরীরা বন্দনা-গান কর্‌তো—হিয়াসিন্‌থিয়োস্, হিয়াসিন্‌থিয়োস্।

আর একটু ওপরে যখন উঠে এসেচি, দেখি মন্দিরের সোপানের ধাপে-ধাপে কুঞ্চিত দেহে, নানা ভঙ্গীতে অসংখ্য নর-নারী চোখ বুজে বসে' রয়েছে। হঠাৎ মন্দিরের পুরোহিতের কণ্ঠস্বর কানে এলো—যেন ডেকে সবাইকে কী বল্‌ছে। অম্‌নি এক নিমিষে মন্দির আঙিনায় অগণিত অর্দ্ধ-নগ্ন পুরুষ একটা মৃদু, লীলায়িত, একটানা সুরের তালে-তালে নাচ্‌তে আরম্ভ কর্‌লো।

নৃত্যের ছন্দ ও গতি ক্রমেই উগ্র ও দ্রুত হ'তে-হ'তে অবশেষে তাণ্ডবে পবিণত হোলো। কারুর মাথায় মাথা ঠেক্‌চে; কারুর বুক আর-কারুর পিঠে এসে লাগ্‌চে—আকাশের দিকে দু'হাত ছড়িয়ে দিযে এই নৃত্য-পাগল জনসংঘ সঙ্গীতের আর্ত্তনাদে সে-আকাশ ছেয়ে ফেল্‌লো, আর যেন একসঙ্গে তবঙ্গিত হ'য়ে দুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তাদের পীত দেহের ওপব জ্যোৎস্নার শুভ্র প্লাবন ছড়িয়ে পড়ে' একটা অশবীর সৌন্দর্য্যেব সৃষ্টি কর্‌লো। রাত দু'টো অবধি অবিশ্রাম আনন্দ-নৃত্য চল্‌লো: তাবপর উৎসব-শেষ।

জাপানী উৎসবের এ-চিত্রটির চাক্ষুষ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে একবার যাদের মনে তাব ভেতরের রূপটি অঙ্কিত হোযে গেছে, তাদের পক্ষে জাপানী নাট্যশিল্পের মর্ম্মকথাটা বুঝে নিতে খুব সহজ হবে।

মন্দির-প্রাঙ্গনে দেবতার উৎসব-আয়োজন-এর সঙ্গেই

বরাবর জাপানে নাটকাভিনয় হোয়ে এসেচে। প্রাচীনকালে প্রায় সব দেশেই নৃত্য-গীত-বাদন দেব-দেবীর পূজা-অর্চ্চনার আনুসঙ্গিক ছিল। মোটামুটি বল্‌তে গেলে সব দেশেরই নাট্য-শিল্পের প্রথম অনুপ্রেরণা এসেচে প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান থেকে। গ্রীসে 'ব্যাকাসের' উৎসব ছিল; জাপানে আজও 'এনিয়ো'-উৎসব আছে। ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মতো জাপানে-ও নাট্য-শিল্প জন্মলাভ করেছে উৎসব-ক্রীড়া থেকে। বল্‌তে গেলে, 'কাগুরা'-নৃত্য থেকেই জাপানের প্রাচীনতম নাটকের জীবন-সঞ্চার হোয়েচে।

আজো কামাকুরা ও নাগইযা অঞ্চলের শিণ্টো ধর্ম্মাবলম্বীদের মন্দিরে-মন্দিরে 'কাগুরা'-নৃত্যের প্রচলন র'য়েচে। আমাদের দেশে সংস্কৃত নাটকের জন্ম-কথা সম্বন্ধে যেমন একটি প্রচলিত প্রবাদ-কথা রয়েছে, জাপানেও তেম্‌নি আছে। জাপানী জন-সাধারণেরা বহুকাল থেকে বিশ্বাস ক'রে আস্‌চে যে, সূর্য্যদেবী তাঁর ভাই সুসানো-ওনো-মিকাটোর আচরণে বিরক্ত হ'য়ে একবার এক গুহার ভেতরে লুকিয়েছিলেন। যখন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হ'যে গেলো, স্বর্গের দেবতারা প্রমাদ গণ্‌লেন। শেষে আর কিছু ঠিক কর্‌তে না পেরে তাঁরা সূর্য্যদেবীর মন ভোলাবার জন্যে অপ্সরা উজুমে-কে গুহার সুমুখে গিয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য কর্‌তে পাঠিয়ে দিলেন। সূর্য্যদেবী প্রসন্ন হ'য়ে গুহা থেকে বেরিয়ে অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর্‌লেন: আবার পৃথিবী আলোকে পরিপূর্ণ হোলো। দেবতা ও মানুষ একসঙ্গে আনন্দোৎসব কর্‌লো। এই পৌরাণিক ঘটনাকে অবলম্বন ক'রেই জাপানে 'কাগুরা'-নৃত্য প্রচলিত হোলো।

*

প্রাচীন জাপানী নাটককে মোটামুটি চার ভাগে ফেলা যায়ঃ 'ইয়োক্-ইয়োকু' অথবা 'নো'; 'কিয়োজেন্' বা প্রহসন; 'কাবুকী' (সাধারণতঃ আড়ম্বর ক'রে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবার জন্যে লেখা) এবং 'জোরুবি', মানে, পুতুল-নাচ।

'ইয়োক্-ইয়োকু' বা 'নো' ধরণের নাটকগুলির বেশির ভাগই গান। প্রত্যেকটার প্লট্-ই জাপানী প্রাচীন লোক-সাহিত্য বা পুরাবৃত্ত থেকে নেয়া। তা ছাড়া, যে-সব পুরাণো গল্প খাঁটি ইতিহাসের অন্তর্গত নয়, সে-গুলোকেও 'নো'-নাটক বরাবর অবলীলাক্রমে গ্রহণ ক'রে এসেছে। 'গেঞ্জির'-র গল্প (The Story of Genji) 'নো'-নাট্যের মস্ত বড় উপাদান। 'নো'-র ঢঙ্‌টা খুব সাদাসিধে। ছোট ছোট কথোপকথন, দু'চার লাইনের স্বগতোক্তি ও অনতিবিস্তর বর্ণনা গানের মাঝে-মাঝে সাধারণতঃ ঢুকিয়ে দেয়া হয়।

নায়কের মুখের কথাগুলোকে জাপানীভাষায় 'মিচিইয়ুকি' বলে। অধিকাংশ 'নো'-নাটকেই নায়কের জীবনের ওঠা-পড়ার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস দেখানো হয়। সাধারণতঃ দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, নাটকের প্রারম্ভে একজন বৌদ্ধ পুরোহিত দেশ-পর্য্যটনে বেরিয়েছে; মাঝখানে, মানুষের আকার নিয়ে অবতীর্ণ একটা প্রেতাত্মা বৌদ্ধ পর্য্যটকের কাছে সে তার গত জীবনের কাহিনী বল্‌ছে; এবং শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষু সেই প্রেতাত্মারই শান্তির জন্য প্রার্থনা করছে।

অভিনয়কালে 'নো'-নাটকের অভিনেতারা কাঠের মুখোস পরে' অবতীর্ণ হয়, এবং একটা বাঁশি ও দু'টো ছোট-ছোট তব্‌লার তালে-তালে নাচতে থাকে। নৃত্যের ভঙ্গী খুব ঋজু

ও গম্ভীর। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত নাটকের সব কথাই তা'রা স্তোত্রের মতো সুর দিয়ে গান করে। নায়কের গানগুলি প্রায়ই আমাদের দেশের যাত্রার জুরীর মতো দশ-বারোটি ছেলে একসঙ্গে মিলে' গায়; কিন্তু তা'রা কখনো জুরীর মতো আসরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রঙ্গভূমির চারিদিক ঘুরে ঘুরে গায় না।

প্রায় এক হাজার 'নো'-নাটক লেখা হোয়েছিলো, কিন্তু এখন তার ভেতর প্রায় আটশ'র মতো অবশিষ্ট আছে। এর ভেতর আবার মোট দু'শ' নব্বুইখানা অভিনীত হোয়েছে। কোনো কালেই 'নো' নাটকগুলি জাপানী জন-সাধারণের খুব রুচিগত হোতে পারেনি, তার কারণ দেশের বৈঠকী গানের মতো সেগুলি জাপানের সম্ভ্রান্ত এবং বাংলা উচ্চবিত্ত লোকের সখের জিনিষ ব'লেই চিরকাল পরিগণিত হোয়ে এসেচে।

জাপানী ইতিহাস খুঁজ্‌লে দেখা যায় যে, ১১ থেকে ১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'নো'-নাট্যের খুব বেশি প্রচলন হোয়েছিল। কিন্তু যে-গুলি আজকালকার জাপানী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোচ্ছে, সে-গুলো 'মুরোমাচি' আমলের (১৩৩৪—১৫৬৫) লেখা। 'নো' কথাটার মূল অর্থ হচ্ছে অনুষ্ঠান: 'সারুগাকু-নো-নো' এই পুরো কথাটার-ই ভগ্নাংশ।

'সারুগাকু' বলতে জনপ্রিয় সঙ্গীত-ই বোঝায়। 'মুরোমাচি'-আমলের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি শিন্টো ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয়ে গড়া ছিল; কাজেই সেই সময়ে যারা 'নো'-নাটকের অভিনয় কর্‌তো,তাদের বলা হোতো 'সারুগাকু-নো-হোশি' —অর্থাৎ সারুগাকুর ধর্ম্ম পুরোহিত। 'ইয়েদো'-আমলে

(১৬০৩—১৮৬৮) 'নো'-র প্রতিপত্তি ছিল সব চেয়ে বেশি; তখন তা জাপানের অভিজাত ও যোদ্ধৃশ্রেণীর আমোদ-প্রমোদের ভেতরে অতি উচ্চস্থান অধিকার কোরেছিল। একজন জাপানী নাট্য-সমালোচক বলেছেন যে, 'ইয়েদো'-আমলের অনেকগুলো 'নো'-নাটকের মুখ্য ভূমিকাগুলি জাপানের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ ও সেনানায়কেরা অভিনয় করতেন।

'নো'-নাটকের সব চেয়ে বড় দোষ: বর্ণিতব্য বিষয়ের অস্পষ্টতা। যদিও লিখ্‌বার বিশেষ ভঙ্গীটি প্রশংসনীয়ই ব'লতে হবে, তবুও প্লটের ভেতর কিছুমাত্র সংবদ্ধতা নেই। জাপানের অন্যান্য নাটকের আগে 'নো'-ই সর্ব্বপ্রথম বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেচে। তার কারণ, এগুলো জাপানের উচ্চাঙ্গ সাহিত্য হিসেবে খুবই মূল্যবান; এবং এদের ভেতর থেকে জাপানী প্রাচীন ধর্ম্মের রীতি-নীতির অনেক খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। কিন্তু আজকালকার জাপানীদের কাছে 'কাবুকী' ও 'জোরুরি' নাটকগুলিই বেশি আদরণীয়।

'কিয়োজেন্'-নাটক এক অঙ্কে লেখা ফাব্‌স্ বা প্রহসন: 'নো'-নাটকেরই মাঝে মাঝে 'ইন্‌টারলূড্'-এর মতো অভিনীত হোয়ে থাকে। 'কিয়োজেন্'-এ কোনোই সঙ্গীত নেই। প্রায় 'কিয়োজেন্'-ই মানুষের দুর্ব্বলতা বা সামাজিক ব্যভিচারকে লক্ষ্য ক'রে লেখা। কাজেই, 'কিয়োজেন্'-এর মাল-মশ্‌লা জাপানী সমাজের সকল শ্রেণীর জীবন-যাত্রা থেকেই সংগৃহীত।

মাঝে-মাঝে কোনো-কোনো 'কিয়োজেন্'-লেখকেরা রূপকথা থেকে-ও প্লট্ নিয়েছে। তাতে 'তেঙ্গু' অথবা

দীর্ঘনাসিক, লম্বোদর প্রেতযোনি একটি অতিপরিচিত চরিত্র। মোটামুটি 'কিয়োজেন' নাটকের প্লট্‌গুলি ভারি অদ্ভুত। *The God of Thunder* নামক একখানা নাটকে একটা ভীষণ দৈত্য পা পিছ্‌লে ধানের ক্ষেতে পড়ে' গেছে; আর একটী ক্ষীণদেহ কৃষকের ধম্‌কানি খেয়ে সে-দৈত্য ভয়ে থর্‌থর্‌ করে' কাঁপ্‌ছে। *Auntie's Wine* নামক আব একখানা 'কিয়োজেনে' এক কৃপণ বৃদ্ধার ভাই-পো দৈত্য সেজে তার পিসীমাকে ভয় দেখাচ্ছে, কিন্তু সে এত বেশী মদ খেয়েচে যে শেষটায় দৈত্যেব কথা ভুলে গিযে লক্ষ্মী ছেলের মতো সে পিসীমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়্‌লো।

'কিযোজেন্‌' জাপানী কথ্য ভাবায় লিখিত, তার ভেতর তীক্ষ্ণ শ্লেষের ঝাঁজ না থাক্‌লেও তার আজ্‌গুবিত্ব দর্শকের হাস্যোদ্রেক করে। সচবাচর 'কিযোজেন্‌' অন্য কোনো নাটকের সঙ্গে ছাড়া অভিনীত হয় না।

'কাবুকী' আধুনিক জাপনের প্রচলিত নাটক। প্রায চার বকমের 'কাবুকী' নাটক আছে। যে-গুলোকে 'মোয়ামোনো' বলা হয, সে-গুলো মোটেই ধর্ম্ম-বিষয়ক নয়; গৃহস্থালীব কথা কিম্বা মানুষের প্রতিদিনেব সাধাবণ সুখ-দুঃখের ঘটনা— এ-সব অবলম্বন ক'বেই 'মোয়ামোনো' সচরাচর রচিত হ'য়ে থাকে। 'জিদাইমোনো' আবাব পুবোপুরি ঐতিহাসিক; কিন্তু প্রাযই তার বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্র কাল্পনিক। ওদিকে 'আবাগোতো-কাবুকী'-র সমস্ত ব্যাপারই অতিরঞ্জিত; চরিত্রগুলি হয় অতি-মানুষ, না-হয় তা'রা অসমসাহসিক বীর। তা'বা ভীষণ, ভযাল দৈত্যের বেশে বঙ্গমঞ্চে এসে অবতীর্ণ হয়। সমস্ত বকমের 'কাবুকী'-র

'শোসাগোতো'-ই হ'চ্ছে খুব চমৎকার। এর বিশেষত্ব হ'চ্ছে এই যে, এতে আধুনিক জাপানী নাট্য-সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সমন্বয় হ'য়েছে।

জাপানী নাট্য-সঙ্গীত সাধারণতঃ তিন ঢঙের: 'নাগাউতা', 'তোকিওয়াজা' ও 'কুযোমোতো'। 'নো'র মতো 'কাবুকী'-ও গান ছাড়া চল্‌তে পারে না। 'কাবুকী'-র ধরণ-ধারণ মূলতঃ 'নো'-র ছাঁচে ঢালা। 'কাবুকী'-র অভিনয়ে, রঙ্গমঞ্চের আড়াল থেকে, আরম্ভ হ'তে শেষ পর্য্যন্ত, একটা চাপা, এক-টানা, মন্থর-রাগিণীর সুর চল্‌তে থাকে; কিন্তু 'নো'-র মতো 'কাবুকী'-র পাত্রপাত্রীরা কথাগুলো সুর ক'রে বলে না। 'কাবুকী' নাটকের অভিনেতাদের পোষাক-পরিচ্ছদ একটু অস্বাভাবিক রকমের। 'নো'-তে যেম্‌নি বাক্যের স্বল্পতা ও গতির মন্থরতা পরিস্ফুট, 'কাবুকী'তে তেম্‌নি থাকে অতিরঞ্জন এবং ভাবের অতিরিক্ত অভিব্যক্তি।

'জোরুরি'-কে শুধু পুতুল-নাচ বল্‌লে ভুল হ'বে। পুতুল-নাচের সঙ্গে-সঙ্গে 'জোরুরি'-র অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চের একটু দূরে ব'সে পুতুলের ভাবভঙ্গী কবিত্বপূর্ণ কথায় ও গানে বিবৃত করে। টোকিওতে প্রায় এক-শ'র ওপরে হুব্যাবাইটি থিয়েটার আছে; সেখানে প্রতি রাত্রে অন্যান্য নাটকের সঙ্গে 'জোরুরি'র-ও অভিনয় হোয়ে থাকে। যারা 'জোরুরি' অভিনয় করে, তারা একসঙ্গে কথক ও গায়ক: তাদের গলার আওয়াজ যেম্‌নি সুষ্ঠু ও সুশিক্ষিত হোতে হবে, তেম্‌নি তাদের বিবৃত কর্‌বার ভঙ্গীও খুব পরিমার্জ্জিত হওয়া চাই। বাঙ্‌লা দেশের কথক ও কবিওয়ালা মিলে' যা হয়, মোটামুটিভাবে তা-ই হচ্ছে 'জোরুরি'-র অভিনেতা।

'ইয়েদো'-আমলে ওসাকা ও কিয়োটোতে প্রায় দশটা 'জোরুরি' নাট্যশালা ছিল ; কিন্তু এখন আছে কেবল একটি মাত্র কিয়োটোতে, আর একটি ওসাকাতে। ওসাকার 'বুন্‌বাকু-জা' থিয়েটার প্রায় একশ' বছর আগে স্থাপিত হোয়েছিলো। জাপানীদের এই 'পাপেট্' থিয়েটারের একটা মজা এই যে, তাতে পুতুল-নাচের কল-কৌশল গোপন কর্‌বার কোনো প্রচেষ্টা নেই। মারিযোনেত্-কে মারিয়োনেত্ ব'লেই জাপানীরা বরাবর স্বীকার ক'রে এসেছে।

ওসাকার ঐ 'বুন্‌বাকু-জা' থিয়েটারে একবার একখানা 'জোরুবি' নাটকের অভিনয় দেখেছিলুম : ঘরে ঢুকে'ই প্রথম চোখে পড়্‌লো একটি মেয়ে : রঙ্গমঞ্চের ওপর বসে' প্রসাধনে ব্যস্ত : একা—আর কেউ নেই। খানিকক্ষণ পরে একটি ছোট্ট ছেলে এলো। মেয়েটি তাকে আলিঙ্গন কর্‌লে। তার পরেই এলো কিমোনো পরে' ছ'জন পুরুষ। তুমুল ঝগড়া : হাতাহাতি : মেয়েটির কান্না। বুঝ্‌লুম, সতীন-পো-সংক্রান্ত গল্প। অন্যদিকে দেখ্‌লুম, সবুজ রঙের কিমোনো পরে' প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের প্রায় তিন ফুট্ ওপরে বসে' দুজন লোক পুতুলগুলো চালনা কর্‌ছে ; কিন্তু এম্‌নি আশ্চর্য্যের কথা এই যে, খানিকক্ষণ পরে যারা পুতুল চালনা কর্‌ছে তাদের অস্তিত্ব ভুলেই গেলুম। মাঝে-মাঝে বিচিত্র রঙের কিমোনোয় ঢাকা আরো দু'চারজন অন্ধকারে ঘোরাঘুরি কর্‌ছিলো ; বুঝ্‌লুম, তারা পরিচালকদের সহকারী হবে। এদের সকলেরই গতি এত সাবলীল ও সময়মাফিক্ লাগ্‌লো যে, পুতুল-নাচের মায়াভিনয় বাস্তব হোয়ে চোখের সুমুখে ফুটে' উঠ্‌লো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানীরা প্রথম বাস্তব ঘটনা-সংক্রান্ত নাটক লিখ্‌তে ও অভিনয় করতে আরম্ভ করে: প্রাচীন কালের বিখ্যাত নাটকগুলোকে কেটে-ছেটে বদ্‌লিয়ে "Plays of the New School" ব'লে চালাতে চেষ্টা করে। প্রথমতঃ আট দশ বছর ধরে' এগুলো খুবই জনপ্রিয় হোয়ে ওঠেছিল; কিন্তু ভালো অভিনেতার অভাবে সেগুলো বেশি দিন টেকে নি।

অল্পদিন হোলো জাপানে এক নতুন ধরণের 'কাবুকী' নাট্যকার দেখা দিয়েছে। তারা প্রাচীন নাট্য-শিল্পের কায়দা-কানুন বর্জ্জন ক'রে বর্ত্তমান সময়ের জাপানী দর্শকের রুচিগত নাটক লিখ্‌তে আরম্ভ করেছে। এ-সব নাটকে সঙ্গীত এক রকম নেই বল্‌লেই চলে; এগুলো অতিরঞ্জন দোষে একটুও দুষ্ট নয়; প্রায় সবগুলিই বর্ত্তমান জাপানী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা অবলম্বনে লেখা।

যদিও কোনো-কোনোটার প্লট্‌ প্রাচীন জাপানের জীবন-কথা থেকে নেয়া, তবুও তাতে মামুলি ধরণের 'কাবুকী'-র কোনো গন্ধ নেই। এই অতি-আধুনিক 'কাবুকী' নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হচ্ছেন শোয়ো-ৎসুবো-উচি। ইনি শেক্সপীয়রের অনেকগুলো নাটক জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এই লেখকের সঙ্গে এইখানে আর একজন আধুনিক নাট্যকারের নাম করা উচিত: কিদো ওকামোতো। তিনি প্রায় একশ'খানা নতুন ধরণের 'কাবুকী' নাটক লিখেছেন। তার মধ্যে সব চেয়ে নাম-করা হচ্ছে *The Tragedy of Shusenji*, *The Origin of Sake* এবং *Lady Hosokawa.*

ইয়োরোপের যুদ্ধের পর থেকেই জাপানে বিদেশী হাওয়াটা আরো জোরের সঙ্গে বইতে সুরু করেছিল; কিন্তু জাত হিসাবে জাপানীরা ভয়ানক পিউরিট্যান্। ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কব্জায়, ও পোষাক-পরিচ্ছদে জাপানীরা পশ্চিমের হুবহু অনুকরণ কর্‌লেও সাহিত্য ও নীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আদব-কায়দা খুব সহজে গ্রহণ তারা কর্‌তে রাজী ব'লে মনে হয় না। এমনকি, ওসাকার উদারনৈতিক জাপানীদের মধ্যেও লক্ষ্য করেছি যে, কেউ কেউ ইয়োরোপীয় সঙ্গীত আরম্ভ হওয়া মাত্রই তাদের ওয়ার্‌লেস্ বন্ধ ক'রে দেয়।

পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তা সত্বেও জাপানীদের জাতীয়তাবোধ খুব তীব্র এবং ঝাঁজালো। সেই জন্যে জাপানের থিয়েটারে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ-প্রচেষ্টা এখনও উগ্র হয়ে উঠে নি। হালে অবিশ্যি, টোকিও-র ইম্পিরিয়াল্ থিয়েটারে টলার্, মেট্যার্‌লিঙ্ক্, পিরান্‌দেল্লো, চেহভ্ ও শেইক্‌স্‌পীয়্যর্ নিয়মিত রূপে অভিনীত হোয়ে থাকে। টোকিও-র একটা থিয়েটারে ব্যর্নাড্ শ'-র 'সেইন্ট্ জোন্'-এর জাপানী সংস্করণ দেখে মনে হোয়েছিল: জাপানীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইয়োরোপের ভালো অনুকরণ কর্‌তে শিখে' থাক্‌লেও ইয়োরোপের আর্টিষ্টিক্ দিকটার খুবই খারাপ অনুকরণ করে; অভিনেতারা কেউই ইয়োরোপের অভিনয়-শিল্পের বিশিষ্ট ভঙ্গীর কোনো খবর রাখে ব'লে মনে হোলো না। তারা যেন দীয়াঘ্‌লিয়েভ্-ব্যালে-র কাষ্ঠ-সৈনিকদের মতো—যন্ত্রচালিত ক্রীড়নক। আর সেই অভিনয়ে সব চেয়ে অদ্ভুত লেগেছিলো অভিনেতাদের সাজসজ্জা।

আসল-নকলে মিলে' জাপানীরা হোয়ে পড়েচে অদ্ভুত মানুষ: আধুনিকতা যেন ওদের একটা বাই। কাজেই, পাশ্চাত্য রীতিনীতির প্রভাবে পড়ে' জাপানী নাট্য তার স্বাভাবিক পীতত্ব ঘুচিয়ে ফেলে আজ খানিকটা শ্বেত হোয়ে উঠেচে; কিন্তু তাতে যেন সেই শ্বেত রঙ্‌টা মোটেই মানায় নি। সেই বিকৃত শাদার ফাঁকে-ফাঁকে স্বাভাবিক হলদের ঝিলিক্ প্রতি মুহূর্ত্তে দৃষ্টিকে আহত করে।

আমার কথাটি ফুরোয় না

নাটক বা থিয়েটার ব'ল্তে বাঙ্‌লা দেশে সাধারণতঃ আমরা ও-দুটোর কোনোটাই আলাদা ক'রে বুঝি না। আমরা বলি ঃ "থিয়েটার দেখ্‌তে যাবো", তার মানেই নাটক। আবার এ-ও বলি ঃ "অমুক বেশ থিয়েটার করে"; তার মানে অবিশ্যি অভিনয়। কাজেই চল্‌তি কথায় বাঙ্‌লা দেশের লোকের কাছে থিয়েটার জিনিষটা নাটক এবং নাটকের অভিনয় দু'টোকেই বোঝায়। কিন্তু বাইরে থেকে দেখ্‌তে গেলেও মোটামুটি ভাবে নাটক ও থিয়েটারের ভেতর যে প্রভেদ র'য়েচে সহজেই চোখে পড়া উচিত।

নাটক জিনিষটা—সাহিত্য, লেখা। থিয়েটার হ'চ্চে রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ইত্যাদির অবলম্বনে সেই সাহিত্যেরই যথাসম্ভব অনুরূপ অভিব্যক্তি। নাটক-সাহিত্য ও নাটক-অভিনয় এই দুটোর ভেতরে যে পার্থক্য র'য়েচে আমাদের দেশের নাট্যকার, অভিনেতা ও অভিনয়-প্রযোজকদের সর্ব্বদা মনে থাকে না ব'লেই বাঙ্‌লা থিয়েটারে এত জঞ্জালের সৃষ্টি।

বাঙ্‌লার নাট্যকার ভাবেন ঃ আমি যা লিখি তা যেহেতু নাট্য-সাহিত্য সেহেতু সেটা নিশ্চয়ই অভিনয়োপযোগী। অভিনেতা ভাবেন ঃ রঙ্গ-মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি যা বলি ও করি সেটাই নাটক, তা না হোলে নাট্যকার সেরূপ কেনই বা লিখলেন ও নির্দ্দেশ ক'রলেন? আর, নাট্য-প্রযোজক নাটক খানি হাতে পেয়ে ভাব্‌লেন ঃ যখন ওটাতে কুশীলব র'য়েচে,

বিয়োগাত্মক বা মিলনাত্মক একটা প্লট্ র'য়েচে, গান র'য়েচে, হাস্য-কৌতুক র'য়েচে, কথোপকথন, আত্মগত-বিবৃতি-ও র'য়েচে—এক কথায় বাঙ্‌লা-নাটক ব'লতে যা বোঝায় সবই র'য়েচে, তখন সেটাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে একবার খাড়া ক'রে দিতে পারলেই তো হোলো। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের নাট্যকার কী কখনো ভেবে দেখেচেন যে তাঁর লিখিত নাট্যখানা সাহিত্য হিসেবে খুব মনোজ্ঞ হ'লেও সেটা থিয়েটারোপযোগী না-ও হোতে পারে? আর নাট্য-প্রযোজকদেরও জিজ্ঞেস্ করছি: কোনো নাটকে প্লট্, গান, বক্তৃতা, কথোপকথন, সব কিছু বাহ্যিক ও আনুসঙ্গিক নাটকীয় বস্তু থাকা সত্ত্বেও সেটা কী সব সময়ই অভিনয়-যোগ্য নাটক?

নাটক ও থিয়েটার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবেই বাঙ্‌লা দেশে আজও এমন নাটক রচিত হোচ্চে যা নাটক নয়; আজও এমন থিয়েটারে যেতে হোচ্চে সেখানে আর যাই হোক্ নাটকের অভিনয় হয় না।

এ-অবস্থার জন্য নাট্যকার বেশী দায়ী কী নাট্য-অভিনায়ক বেশী দায়ী তা ঠিক করে বলা শক্ত। অন্ততঃ, এ-দেশের নাট্য-অভিনায়কদের বিদ্যা, বুদ্ধি বা পারদর্শিতা সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা করবার সুবিধে বাইরের লোকের বেশী হয় না, কিন্তু যিনি নাট্য-রচয়িতা তাঁর পক্ষে আত্মগোপন ক'রে থাকা একটু শক্ত। তিনি তো আর নাট্য-পরিচালকের মতো রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তরালে মুখ লুকিয়ে থাকতে পারেন না; অভিনয়ের সময়ে তাঁর লেখা আমরা কাণ দিয়ে শুনি এবং মন দিয়ে বিচার করি। আর অভিনয় না দেখলেও তাঁর নাটক যখন সাহিত্য, তখন তো ছাপার হরফেই দেখতে পাই।

কাজেই নাট্যকারকে হাতে-কলমে ধরা যায়। আর নাট্য-কারের কাজও তো কথা গাঁথা, তাও বিশেষ করে যখন তিনি বাঙ্‌লা নাটক লেখেন। তিনি আর কিছু পারুন আর না পারুন, কথা লিখতে পারেন-ও, জানেন-ও।

বাঙ্‌লা থিয়েটারে গেলে কথা শুনতে শুনতে কাণ ঝালাপালা হয়ে যায়—মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করে। কথা—কথা—কথা! এক নিশ্বাসে অভিনেতা বা অভিনেত্রী যতগুলো কথা ব'লে উঠতে পারে ততগুলো, এবং অনেক সময় তার চেয়েও বেশী কথা, বাঙলা দেশের নাট্যকার লিখে রেখেচেন: গড়-গড় করে আবৃত্তি অথবা এক-ঘেয়ে সুরে স্বগত-ভাষণ—সেই যা মান্ধাতার আমোল থেকে চ'লে আসচে। যারা অভিনয় করে সে বেচারাদেরই বা দোষ কী?

নাট্যকার নাটক লিখবার সময় তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবেন না। ভাবের আতিশয্যে যা মনে এসেচে তাই লিখে ফেলেচেন, অভিনয়সাপেক্ষতার কথা তাঁর মনেই হয়নি। আবার এক কিস্তি বলে শেষ ক'রেও নট-নটীদের নিষ্কৃতি নেই; কিস্তির পর কিস্তি, সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো শ্রোতৃ-মণ্ডলীর কর্ণ-কূলে এসে কথার স্রোত আছ্‌ড়ে পড়্‌চে; যবনিকাপতন না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রোতা বা অভিনেতা কারুরই অব্যাহতি নেই।

অন্যের লেখা মুখস্থ ক'রে দশজনকে শোনাবার মতো শাস্তি মানুষের আর হোতে পারে না; আবয়বিক অভিব্যক্তির কথা নাহয় ছেড়েই দিলুম। তাও যদি নাট্যকার তাঁর নাটকে দয়া করে একটু বাক্-সংযম চেষ্টা ক'রতেন তা'হলে

না হয় অভিনেতৃরা একটু একটু প্রাণের রস কখনো কখনো তার ভেতরে ঢাল্‌তে পারতো।

যতদিন কথার ভারে বাঙ্‌লার নাটক নিপীড়িত হোয়ে থাকবে ততদিন বাঙ্‌লা থিয়েটারে প্রশংসাযোগ্য অভিনয় কী করে সম্ভব তা বুঝে উঠি না।

নাটকের প্রাণ-বস্তু যে কথোপকথন—শুধু কথা নয়—এ-কথা কে না জানে? তবুও নাটকে স্থান-কাল-পাত্র অনির্ব্বিশেষে স্বগত-বিবৃতি, অথবা অসংলগ্ন, আত্ম-বিস্মৃত আবৃত্তিব এত বাড়াবাড়ি কেন? বাঙ্‌লা দেশের লেখকেরা সোজা, স্পষ্ট এবং কেবল পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত কথোপকথনের ভেতব দিয়ে নাটক কেন সৃষ্টি ক'রতে পারেন না? স্বাভাবিক মানুষ—উত্তেজিত, শান্ত কিম্বা ক্রুদ্ধ, যে-অবস্থাতেই হোক্, যেরূপ আচবণ কবে, ঠিক তারই অনুরূপ প্রতিকৃতি-ই তো আমরা রঙ্গমঞ্চে দেখতে আশা করি। এই যে আচরণ তার প্রকাশ কথাতে হওয়াই সব চেয়ে বেশী সহজ ও স্বাভাবিক; কিন্তু সব সময়ে কথা দিয়েই হোতে হবে তারও কোনো মানে নেই, ভাব, ভঙ্গী, চলা-ফেবা, এমনকি চোখেব একটি মাত্র চাউনি কিংবা কণ্ঠস্বরের একটী মাত্র বিশিষ্ট ভঙ্গিমার ভেতর দিয়ে-ও সে-আচবণ প্রকাশিত হোতে পারে।

ধরা যাক্, কোনো অভিনেতা রাগের ভাবটী প্রকাশ ক'বতে চান: তিনি চীৎকাব ক'বে কাউকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার ক'রচেন। ক্রুদ্ধ অবস্থাতে মানুষের চিত্তবিক্ষেপ হওয়া যেরূপ স্বাভাবিক সেরূপ সঙ্গে-সঙ্গে তাব শারীরিক অবস্থার-ও পবিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক; কাজেই শুধু বাক্য দিয়েই এই রাগের ভাবটীর সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হওয়া অসম্ভব।

রাগ হোলে অনেক সময় মুখ দিয়ে কথা না-ও বার হতে পারে—সেটা রাগের বিশেষ অবস্থা বা আতিশয্যের উপরই নির্ভর করবে; এবং এই অবস্থাতে মুখ-চোখের ওপর অনেক প্রকারের চিন্তার প্রতিক্রিয়া হোতে পারে। আবার রাগ থেমেও যেতে পারে এবং থেমে গেলে চেহারার-ও পরিবর্ত্তন হওয়া অনিবার্য্য। সুতরাং রাগ জিনিষটাকে কোনো মামুলি থিয়েটারি ঢং-এর ছাঁচে ফেলা যেতে পারে না।

আসল কথা এই যে, বাঙ্‌লা দেশের নাট্যকার সাধারণতঃ অভিনয়োপযোগী করে কথা গাঁথতে চেষ্টা করেন না। তার ফলে, বাঙলার নট-নটীরা কোনো প্রকারের মানসিক অবস্থাতেই সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষের মতো কোনো কথা—কখনো আস্তে, কখনো জোরে, কখনো থেমে-থেমে, কখনো তাড়াতাড়ি—স্তরে-স্তরে, পলে-পলে প্রকাশ করবার সুবিধা পায় না।

নাট্যকার কথা দিয়ে তাদের আটকে রেখেছেন। সুতরাং তাদের ত্রুটী যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশী নাট্যলেখকের। থিয়েটার দেখে বেরিয়ে এসে আমরা বদনাম করি অভিনেতা বা অভিনেত্রীর: অমুক কিছুই পারলে না; অমুকের বলার ভঙ্গী বিশ্রী, ইত্যাদি। এর একমাত্র কারণ এই যে, যারা বাঙ্‌লা থিয়েটারে যাতায়াত করে তারা ভালো-ই বাসে কথা শুনতে; অবিশ্যি গান তো আছেই। কথা থেমে গেলে গান, গান থেমে গেলে কথা, আবার কথা ফুরিয়ে গেলে নাট্যরূপ নটে-গাছটীও মুড়িয়ে গেলো। কথা ছাড়া নাটক হয় না সে-কথা মূর্খেও জানে; কিন্তু কেবলই কথা

দিয়ে নাটকের প্রাণ-বস্তুকে নির্য্যাতন ক'রলে সেটা হয় মূর্খামি।

এই বাক্য-নির্য্যাতনের দরুণ বাঙ্‌লার নাটক কত প্রাণহীন ও পঙ্গু হোয়ে পড়ে আছে তা একবার আমরা ভেবেও দেখি না। প্রাচীন বা আধুনিক কোনো নাট্যকারের নাম উল্লেখ করে কিছু না হয় না-ই বল্লাম। এ দোষটা বহুদিন থেকে বাঙ্‌লা থিয়েটারে চলে আসচে। গিরীশ বাবু ও দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে আরম্ভ করে রবিবাবু, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও যোগেশ চৌধুরী পর্য্যন্ত সবাইর-ই লেখা এই দোষে দুষ্ট: কম আর বেশী এই যা।

যে-নাটক বাড়ী বসে পড়তে ভালো লাগে সে নাটক-ই যে অভিনয়-কালে ভালো লাগবে তার কোনো অর্থ নেই; আবার থিয়েটারের দিক দিযে কোনো নাটক হযতো খুব ভালো লাগতে পারে যার সাহিত্যিক মূল্য খুবই কম। পড়তে ভালো-লাগা সাহিত্যের গুণ; আর দেখতে ভালো-লাগা বা শুনতে ভালো-লাগা অভিনযের গুণ। কাজেই, নাটক লিখিত এবং নাটক অভিনীত, এদু'য়ের ভেতরে আসমান-জমীনের তফাৎ; এ কথা যত শীগ্‌গির আমরা মেনে নেবো তত শীগ্‌গিরই আমাদের বাঙ্‌লা থিযেটারের পক্ষে মঙ্গল।

পাশ্চাত্য-জগতে আজ বেশীর ভাগ নাটকেরই সাহিত্যিক মূল্য খুব সামান্য; অভিনয়-যোগ্যতাই তার একমাত্র যথার্থ মূল্য। সেইক্‌স্‌পীয়্যর্‌ বা ইব্‌সেন্‌-এর নাটক সাহিত্য হিসাবে সে-দেশের লোক যে একেবারে পড়ে না তা বলচি না, কিন্তু নাট্যকার হিসেবে সেইক্‌স্‌পীয়্যর্‌ বা ইব্‌সেনের বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতি তাঁদের রচিত নাটকের অভিনয়-যোগ্যতার জন্যই।

আধুনিক-যুগের ইউরোপের নাট্য-রচয়িতা জানে যে তার নাটকের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য তাকে থিয়েটারের ওপরেই নির্ভর ক'রতে হবে; কেননা থিয়েটারেব হাতেই র'য়েচে সব কল-কব্জা, মাল-মশলা, সাজ-সরঞ্জাম—যে-সব জিনিষের সাহায্য নেওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। থিয়েটারের বাহ্যিক ও আনুসঙ্গিক যাবতীয় প্রতিপাদ্য বস্তুর ওপর লক্ষ্য রেখে তাকে নাট্য রচনা ক'রতে হয়। কথা অবশ্যই নাটকের বাহন হবে; কিন্তু নাটককে রূপ দিতে হবে থিয়েটারের মধ্য দিয়েই।

পছন্দসই না মানানসই ?

গান জিনিসটা আবহমান কাল থেকে বাঙলা নাটকাভিনয়ের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত হোয়ে আছে। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কীর্ত্তন, টপ্পা, কবি—সর্ব্বপ্রকার প্রাচীন নাটকীয় ও অর্দ্ধ-নাটকীয় অভিনয়েই গান একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে এসেচে ; এবং বর্ত্তমান যুগেও থিয়েটার থেকে তা লুপ্ত হয়ে যায় নি।

বাঙালী যে গীতানুরাগী জাতি সে কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। শুধু নাটকে কেন, গদ্য, পদ্য, কথা, কাহিনী—বাঙালীর যাবতীয় সাহিত্যেই গীতিরসেরই আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। নাট্য-অভিনয়ে ও নাট্য-রচনাতে গানের প্রয়োজনীয়তা আমরা বরাবর নির্ব্বিবাদে মেনে এসেচি ; কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে নাটকাভিনয়ে গানের যথার্থ তাৎপর্য্য কী, সার্থকতাই বা কী, সে-সম্বন্ধে খুব কমই বোধ হয় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে।

বহুদিন থেকে যে-জিনিষের চল্‌তি, তাকে নির্ব্বিবাদে মেনে নেওয়া আমাদের একটা জাতিগত অভ্যাস, সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করাটা হয় নির্ব্বুদ্ধিতা, নাহয় আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নেওয়ার মতো! নতুনত্বের বড়াই নিয়ে আজকাল বাঙলা দেশে দু'একটা নতুন রঙ্গালয় স্থাপিত হোয়েচে ; এবং নতুন অনেক নাটকেরও অভিনয়-ও সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্চে। অথচ, এই গান জিনিষটা, যা দিয়ে হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার হয়, সেই গানকে রঙ্গমঞ্চে

এখনো সেই চিরাভ্যস্ত, মামুলি ঢং এতে শুনতে হয় এবং সহ্য করতে হয়।

যদি গান নাটকে সঙ্গত ও সার্থক ক'রে না দেখানো হয় তবে গায়ক-গায়িকাদের গালমন্দ করেই বা কী হবে? তারা তো পুতুল-নাচের কাঠের পুতুলেরই মতো থিয়েটারের নির্দেশ মতো গান গেয়ে যায়।

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ লোকই বোধ হয় থিয়েটারে যায় গান শুনতে ঃ কথা শুনে শুনে যারা হয়রান হোয়ে পড়ে, গান আরম্ভ হোতে না হোতেই তারা কান খাড়া ক'রে চাঙ্গা হোয়ে বসে। এ অবস্থার দুরকম অর্থ হোতে পারে ঃ হয়, যে-সব কথার ফাঁকে-ফাঁকে, পর-পর, নাটকে গান বসানো হয়, সে-সব কথা তাদের কাছে নাটকের একটা বাহুল্য স্বরূপ; নতুবা, তারা নাটকে গান জিনিষটাই এত বেশী প্রত্যাশা করে যে, গান আসতে একটু দেরী হোলেই তারা উস্-খুশ্ করতে থাকে। যে-সব কথার পরে গান আসবে (হয়তো তখন আসাই উচিত নয়), সে-সব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা তারা নিরর্থক মনে করে। কোন্ কারণটা সত্যি ঠিক বলা শক্ত—হয়তো দু'টোই; কিন্তু গানের আধিক্য বা অসঙ্গতির জন্যই যে অনেক সময় বাঙলা নাটক ব্যর্থ হোয়ে যায় তাতে আর সন্দেহ নেই।

প্রথম দেখা যাক্ নাটকে গানের প্রয়োজনীয়তা কী এবং কতখানি। বাস্তব জীবনে খেতে-বসতে-শুতে আমরা যে সবসময় গান গাই না সে-কথা না মেনে উপায় নেই, কোনো সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ ব্যবহারিক জীবনে সময়ে-অসময়ে কিম্বা বিনা প্রয়োজনে গান গেয়ে উঠলে তাকে আমরা পাগল

বলি ; অন্তুতঃ পাগল না বললেও তাব যে কোনো কারণে চিত্তবিক্ষেপ ঘটেছে সে-কথা আমাদের মনে হোতে পাবে ; কেননা, তার এরূপ আচবণ কেবল অসঙ্গত নয়, অস্বাভাবিক-ও। অথচ, বাঙ্‌লা দেশেব রঙ্গালয়ে এই প্রকার অনেক অস্বাভাবিক অবস্থায়, অকাবণ গান-গাওযা প্রতিদিন আমাদের শুন্‌তে হয়।

সমগ্র নাটকের আখ্যান-বস্তু, কিম্বা পূর্ব্বাপর অভিব্যক্তির সঙ্গে এই গান-গাওযাব কোনো মিল বা সম্পর্ক আছে কিনা সে কথাটা আমরা একটুও ভেবে দেখি না। এর একমাত্র কাবণ : আমরা বাঙালী ; গান শুনতে যখন আমাদের ভালো লাগে, তখন হোক্ না গান যখন খুসী, কানে শুনতে যখন ভালো লাগ্‌চে তখন নাটকে গান কোথায়, কখন হওয়া উচিত বা অনুচিত সে বিচার ক'রে কী হবে? সুতরাং রঙ্গালয়ের কর্ত্তাবাও গানের ঔচিত্য ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাবাব প্রযোজন বোধ কবেন না।

বাঙ্‌লা থিয়েটারে এ-কুসংস্কাব এখনও র'য়েচে যে, গান-ছাডা যে-হেতু বাঙলা নাটক কোনে কালে জমেনি, আজও জমবে না। যিনি নাটক লিখেচেন, তিনি হয়তো গানের জন্য কোনো আলাদা জাযগা রাখেন নি, অথবা তিনি নিজে গান বাঁধতে-ও হয়তো জানেন না। কিন্তু তা হোলে তো চলবে না : পাক্‌ডাও কবো এমন লোক যে গান বেঁধে দিতে পারে : লিখিয়ে নাও গান তাকে দিয়ে ; তারপর দৃশ্য, অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক, যার ভেতর যেখানে পাবো বসিয়ে দাও সে গানগুলো—বিশেষ করে, সেই-সেই জায়গায় বসাও যেখানে ট্র্যাজেডি বা কমেডি হয়তো একটু ঘনায়িত হোয়ে উঠেচে,

কিভাবে নাটকটা শেষ হবে তা নিয়ে হয়তো দর্শকেব মন খানিকটা চঞ্চলও হোয়ে উঠেচে : এরই নাম নাকি "রিলীফ্" ।

অর্থাৎ গান দিয়ে ভুলিয়ে দাও, ভাগিয়ে দাও, উড়িয়ে দাও নাটকীয় সমস্যাটি : যা সবে-মাত্র ফুটে উঠেছিল, যা দর্শক-চিত্তে কেবল একটু একটু জল্পনা-কল্পনার আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু জিজ্ঞেস করচি : যাঁরা নাট্য-জগতেব খাঁটি শিল্পী, তাঁবা কী কখনো বলেচেন যে "বিলীফ্" মানেই দর্শকের মনে বিস্মৃতিব সৃষ্টি কবা ? হাঁফ-ছেড়ে বাঁচাব সুবিধে কবে দেওযাব নাম-ই কী "রিলীফ্" ?

যতদূর জানি, "রিলীফ্" বলতে বোঝায় : সময়-সময় নাটকে যে উত্তেজনা বা আলোড়নেব উদ্রেক হয়, তাকে অবসবমতো সংযত করা, কেন্দ্রীভূত করা, ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে রাখা। বাঙ্‌লা দেশেব নাট্য-প্রযোজকেরা "রিলীফের" জন্যে গান দিতে গিযে নাটকেব স্বাভাবিক গতিকে করেন লক্ষ্যচ্যুত; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নাটকেব বহস্যকেও ভেঙ্গে চুরে তুম্‌ড়ে ফেলেন।

তা হোলেই দেখা যায় যে, নাটকে গানেব একটা কাল-পাত্র-সাপেক্ষতা ও ঔচিত্য ব'যেচে। গান ঢুকিযে দিযে বাঙ্‌লা দেশেব শ্রোতৃ-বর্গেব হৃদয় আক্রমণ করা খুবই সহজ এবং বাঙ্‌লা নাটকেব আশ্রয়-ও রক্ষা করা হবে, কিন্তু তাতে কোনো কালে বাঙ্‌লা অভিনযের সৌন্দর্য্য ও সঙ্গতি একটুও বাড়বে না। কাজেই এ-কথা আমাদেব ভাবা নিতান্ত দরকার যে, সব নাটকেই বেহুঁস হয়ে গান বসিযে দেওযাব আগে দেখতে হবে গান-বসানোব প্রয়োজন কিছু আছে কিনা,

এবং প্রয়োজন থাকলে কোন্ নাটকের কোন্ পাত্র-পাত্রীদের কোন্ অবস্থায়, কোন্ স্থলে গান করা স্বাভাবিক ও সমঞ্জস হবে। আর, দেখ্তে হবে সে-গান যেন মানানসই হয়, কেবল পছন্দসই হোলেই চলবে না। বাঙলার নাট্যপ্রযোজকদের কিছুদিনের জন্যে পছন্দসইর কথা একেবারে ভুলে গিয়ে মানানসইর কথা-ই ভাবতে হবে।

এখন ধরা যাক্ নাটকে গানের সার্থকতা বলতে কী বোঝায়। আজকাল কথা-নাট্যে গানের সার্থকতা এক রকম নেই বললেই হয়। নাটকের প্রাণ-বস্তু হোচ্ছে কথোপকথন; নাটক ফুটে ওঠে পাত্র-পাত্রীর বাক্যালাপের ভেতর দিয়েই। প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় মানুষ যেমন কথা দিয়েই মনের ভাব ব্যক্ত করে, রঙ্গমঞ্চে নাটকীয় রূপেও সে তাই কোর্বে ঃ যেহেতু সেরূপ করাটাই তার পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক। তবে বিপদ এই যে, কোনো বাঙ্লা নাটক-ই এখন পর্য্যন্ত পুরোপুরি ভাবে কথা-নাট্য হিসেবে রচিত হয় না এবং সেটা যে-ভাবে বরাবর চ'লে এসেচে সেরূপ ভাবেই প্রদর্শিত হোয়ে থাকে। তার ফলে সেটা হোয়ে দাঁড়াচ্ছে নাচ-গান-রঙ্গ-রস-বাচালতা-ইয়ারকি সব কিছুর খিঁচুড়ী।

বহু দিন ধ'রে বাঙলা দেশে গীতি-নাট্য বলে একটা জিনিষ প্রচলিত আছে, ইংরাজীতে যাকে অপ্রা বলে; এবং প্রথম অবস্থাতে আধুনিক ধরণের গীতি-নাট্য মোটামুটি ভাবে যার অনুকরণে রচিত হোয়েছিল। কিন্তু বাঙলা দেশের অধিকাংশ নাট্যামোদী-ই বোধ হয় জানেন না যে, গীতি-নাট্য ও অপ্রা এক জিনিষ নয় ঃ গীতি-নাট্য হোচ্ছে নৃত্যগীতবহুল কথা-নাট্য, আর অপ্রা মানে

সঙ্গীতাভিনয়; অপ্‌রা-র পাত্র-পাত্রীরা কথা কয় না, কেবল গান-ই গায়।

বিলিতি অপ্‌রা ও বাঙ্‌লা গীতি-নাট্যের ভেতর যখন তফাৎ রয়েছে, থাকুক্‌; গীতি-নাট্যকে বদ্‌লিযে ঠিক অপ্‌রা-র মতো করার কোনোই প্রয়োজন নেই। বাঙ্‌লা দেশ থেকে গীতি-নাট্যকে একেবারে তুলে দিযেও কাজ নেই; কেননা, তা হোলে বাঙালী জাতির পক্ষে সেটা হবে অত্যন্ত অগৌরব ও ক্ষতির বিষয়। ববঞ্চ, দেখিনা গীতি-নাট্যেব জন্মই আলাদা আলাদা নাট্য-শালা আমরা গ'ডে তুল্‌তে পাবি কিনা।

কথা-নাট্য থেকে গীতি-নাট্য পৃথক হ'য়ে গেলে বাঙ্‌লা থিযেটাবের পাঁচ-মিশেলী আবর্জ্জনা চলে যাবে, এবং গীতি-নাট্যেরও একটা নিজস্ব, স্বতন্ত্র স্থান হবে। গায়ক-গায়িকাদেব আর রঙ্গালয়েব ভেতরে অখ্যাত নট-নটী ভাবে জীবন যাপন ক'বতে হবে না; তাদের নৃত্য-গীত-কুশলতা কথা-নাট্যেব ভেতরে আড়ষ্ট হোয়ে থাকবে না। আলাদা গীতি-নাট্যশালা তৈবী হোলে সঙ্গে-সঙ্গে খাঁটি দেশী ঐক্যতান-সঙ্গতেব সৃষ্টি হবেঃ সেই চিবাভ্যস্ত হারমোনিয়মেব ভ্যাঁ-ভোঁ ও ক্ল্যারিওনেটেব পুঁ-পুঁ আর আমাদের শুন্‌তে হবে না। কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে গীতি-নাট্য-শালা বাঙ্‌লা দেশে স্থাপিত হোক্‌ আব নাই হোক্‌, আপা-ততঃ বাঙ্‌লার কথা-নাট্যকে সঙ্গীতবাহুল্য ও অসঙ্গতিব বন্ধন থেকে মুক্ত ক'বতেই হবে। খাপ-ছাড়া, বেমানানসই ও অপ্রয়োজনীয় গান দেওযাব চাইতে গান একেবারে না দেওয়াই ভালো; তাতে দর্শকেবা যতই চটুক্‌ না কেন, যতই

ক্ষুদ্র হোক্ না কেন। বাঙ্‌লা দেশের নাট্যামোদিদের গান ছাড়া কথা-নাট্যকে উপভোগ কর্‌তে শিখতে হবে; অন্য দেশের মতো কথা-নাট্য বাঙ্‌লা দেশে যাতে একটা সুকুমার নাট্যসৃষ্টি হয় সে দিকে বাঙ্‌লা নাট্য-প্রয়োজকদেব চেষ্টা ক'রতে হবে।
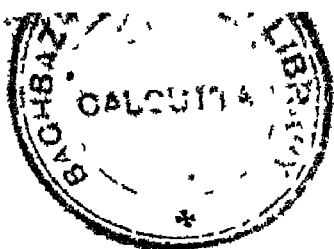
জগুবাবুর বাজার

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে যে-ধরণের নাটকাভিনয় হোতো তাতে প্রেক্ষাঘরের প্রয়োজন ছিল না। এখনও যাত্রা ও তদনুরূপ রঙ্গাভিনয়ে প্রেক্ষাঘরের বালাই নেই। হালে, পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে, বাঙ্‌লা নাটক প্রেক্ষাঘরে অভিনীত হোয়ে থাকে। বিলিতী অণুকরণে "বক্স," "ষ্টল," 'গ্যালারী' ইত্যাদি সবই আজ আমাদের প্রেক্ষাঘরের আনুসঙ্গিক হোয়ে দাঁড়িয়েচে।

ইউরোপীয় ধরণের প্রেক্ষাঘর প্রবর্ত্তন করার দরুণ যে বাঙ্‌লা নাট্য-শালার বিশেষ কোনো লাভ বা ক্ষতি হোয়েচে তা মনে করি না। মাটিতে না ব'সে চেয়ারে ব'সে এ-যুগে অভিনয় দেখার চল হোয়েচে ব'লেই যে আমাদের অভিনয়োপভোগ-কালীন জাতীয় অভ্যাসগুলি বদলে গেচে তা নয়। আগে-আগে, অভিনয়ের সময়ে মাটিতে ব'সেও আমরা সকলে মিলে যে গোলমাল ও কোলাহল করতুম আজোও তা করি; তা, যখন অভিনয় হ'চ্ছে তখন ফিস্‌ফিস্ ক'রে পরস্পরের ভিতরে অভিনয় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করাই হোক্, কী দৃশ্য ও অঙ্কের মাঝখানে, বিশ্রামের সময়, সকলের সম্মিলিত বাক্-বিতণ্ডা ও উত্তেজিত ভাবে কথা কাটাকাটি-ই হোক্।

এই কোলাহলটা যদি শুধু দর্শকের মধ্যেই নিবদ্ধ থাক্‌তো তা হোলে না হয় সেটা একটা সংশোধনীয় অপরাধের মধ্যে ধরা যেতো; কিন্তু এই কোলাহলের সঙ্গে যখন পান-বিড়ি-সোডা-লেমোনেড্-ওয়ালারা সমস্বরে ঐক্যতান বাদনের

অফুরন্ত সঙ্গীতে তাদের সুর মেলায়; তার ওপর যখন আবার জাগ্রত কিংবা অর্দ্ধজাগ্রত বেয়াড়া খোকা-খুকিরা, কখনো ধৈবতে কখনো সপ্তমে, তাদের ক্রন্দন রোল তোলে; এবং মহিলা-মহল থেকে থিয়েটারের ঝিবা: "ওগো শ্যাম-বাজারের হরিপদবাবুর বাড়ীর মেয়েরা কই গো—তোমাদের ডাকচে গো"—ঐ রকম-ই একটা কিছু কাঁসর-ঝঙ্কৃত নিনাদে প্রেক্ষাঘরের ছাদ ফাটাবার উপক্রম করে; তখন মানুষ কেন ভূতেরও বোধ হয় প্রেক্ষাঘব থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে!

তখন মনে হয়, চুলোয় যাক্ আমাদের এই হাল্-ফ্যাসানী প্রেক্ষাঘব, ঢের ভালো ছিল সেই ঠাকুবদা'ব আমোলে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে ব'সে, যাত্রাব সেই নির্দ্দোষ আনন্দ সম্ভোগ: একেই বলে সভ্যতাব শাস্তি!

যাত্রার হট্টগোলটা ছিল যাত্রারই অবশ্যম্ভাবী আনুসঙ্গিক ব্যাপাব; ওটা ধাতে স'য়ে গিয়েছিল এবং বেমানান-ও লাগতো না, ওটাকে প্রত্যাশা ক'রেই আমরা যাত্রার আসরে বসতুম। আব হট্টগোল ছাড়া যাত্রাও ভালো ক'রে জমতো না। এখন আমরা সভ্য হোয়েচি; সভ্য থিয়েটারে গিয়ে সভ্যতাবিরুদ্ধ কোলাহল আব সহ্য হয় না। অনেকদিন ধরে সহ্য কবচি; তাই আজ গললগ্নীকৃতবাস হোয়ে বাংলার নাট্য-মোদী সর্ব্বজনকে বলচি: "দোহাই আপনাদের, এ-অবস্থার একটা বিহিত করুন; না করলে আমাদের সভ্যতার সুনাম আর রইল না।"

এ তো গেলো দর্শকদের ক্রটীর কথা; এখন প্রেক্ষাঘরের মালিকদেব কথা ধরা যাক্। মালিকেরা বলতে পারেন যে, যাবা নাটক দেখতে আসে তারা যদি প্রেক্ষাঘরের শান্তি

রক্ষা না করে তাহোলে তারা একান্ত নিরুপায়। দর্শকদের সম্বন্ধে এরূপ অভিযোগ একেবারে অসঙ্গত নয়; কিন্তু প্রেক্ষাঘরের বিশৃঙ্খলতার জন্যে কী কেবল দর্শকরাই দায়ী? আসল কথা এই যে, বাঙলা রঙ্গালয়ের তত্ত্বাবধায়কেরা প্রেক্ষাঘরের শান্তি, পরিচ্ছন্নতা ও শীলতা রক্ষার প্রতি আদৌ দৃষ্টি দেন না; এক-একটা রঙ্গশালায় তাঁদের নজর এত কমে গেচে যে এখন আর সেখানে শান্তিতে ব'সে কোনো নাটকই উপভোগ করার জো নেই।

এখন তাই হট্টগোল জিনিষটা হোয়ে দাঁড়িয়েচে বাঙলা থিয়েটারের একটা চিরাভ্যস্ত ব্যাপার, সেটাকে সহ্য করার মতো প্রবৃত্তি ও উৎসাহ থাকলে থিয়েটারে যাওয়া, নতুবা বাড়ীতে বসে থাকা।

কী হোলে প্রেক্ষাঘরের শান্তি রক্ষা করা যায় সে-সম্বন্ধে কোনো বাঁধা-ধরা ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া অসম্ভব। তবে চা-পান-বিড়ি-সোডা-লেমোনেড্-ওয়ালাদের মুহুর্মুহু চীৎকার এবং একঘেয়ে-সুরে ঐক্যতান বাদনের বিকৃত ধ্বনি বোধ হয় একটু চেষ্টা করলেই বন্ধ করে দেওয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রুতিমধুর ও মৌলিকতাব্যঞ্জক ঐক্যতান-সঙ্গত আমরা সৃষ্টি করতে না পারি, ততদিন অভিনয়ের বিশ্রাম সময়ে কেবল কন্সার্টের প্রথা রক্ষা করার জন্য, খামোখা কতকগুলি যা-তা আওয়াজ ক'রে প্রেক্ষাঘরের কোলাহলের উগ্রতা আর বাড়িয়ে প্রয়োজন নেই। অবিশ্যি যদি গলার আওয়াজকে কনসার্টের আওয়াজ দিয়ে তলিয়ে দেওয়া-ই উদ্দেশ্য হয় তবে সে কথা স্বতন্ত্র! বাইরে অসংখ্য চা, পান, চুরুট, মিঠাপানির দোকান র'য়েচে;

ফিরিওয়ালাদের কী প্রেক্ষাঘরেব ভেতরে না ঢুকতে দিলেই নয় ?

অন্ততঃ একটি দিনের জন্যে থিয়েটারের মালিকরা কন্সার্ট্ ধ্বনি ও ফিরিওয়ালাদের যাতাযাত বন্ধ ক'বে দিযে দেখুন যে ঘরের আবহাওয়া অনেকটা বদলে গেচে কিনা।

আমরা বাঙালী ; জোরে কথা বলা ও সবাই মিলে এক-সঙ্গে কথা বলা আমাদেব বহুদিনের অভ্যাস। তবুও আমরা থিযেটারওয়ালাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে আমবা এখন থেকে ও অভ্যাসটা শুধ্বে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা কোববো।

এ তো গেল প্রেক্ষাঘবের ঘরের বাহ্যিক উপদ্রবের কথা। ব্যাপারটা আরো একটু তলিয়ে দেখা যাক্। প্রেক্ষাঘরেব মেঝে কী বোজ নিয়মমতো ঝাঁট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ? প্রতি বাত্রে পানেব খোসা ও চুণ-লাগানো পানেব বোঁটা, সিগ্রেটেব টুকরো ও ছাইতে সমস্ত ঘরখানি যে-আবর্জ্জনায ভ'রে থাকে, সেগুলো কী নিয়মিত রূপে ভালো ক'রে ঝাঁট দিয়ে ফেলা হয় ? দেয়ালেব গায়ে ও খোঁচে-খাঁচে যে বহুদিনেব ঝুল্ ও মাকড়সাব জাল সঞ্চিত হোয়ে থাকে সেদিকে কী কখনও থিয়েটাবের কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টি পড়ে ? সেদিনও দেখে এলুম : কল্কাতাব একটা বিখ্যাত থিয়েটারে রঙ্গমঞ্চের দুই পাশেব দুই দেয়ালে টাঙানো গিরীশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের তৈলচিত্র দু'খানির ওপর যে কতদিনের ধুলো জমে আছে তা বলা যায় না। ছবি দুখানি এত মলিন ও মসীময় হোযে গেচে যে মনে হোলো দেয়ালে টাঙানোর পরে আর ছবি দুটো বোধ হয় ঝাড়া হয় নি।

ফুট্‌লাইটের কাঠের তক্তাটার ওপর এত ধুলো জমে থাকে যে সখী-নৃত্য সুরু হোলেই, যে-সব দর্শক বেশী দামের টিকিট কিনে কাউচে বসার সৌভাগ্য অর্জ্জন কোরেচেন, তাদের মুখ, চোখ, জামা-কাপড়ের ওপর বেশ একচোট্‌ ধূলি-বর্ষণ হোতে থাকে।

চেয়ারে বসবার আগে পকেট থেকে রুমাল বার কোরে ঝেড়ে-ঝুড়ে না নিলে কাপড়-চোপড়ের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। চেয়ারে বসেও আবার নিশ্চিন্ত থাকবার জো নেই। অভিনয়ের এক-একটি অঙ্ক অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয় কালো অয়েল্‌-ক্লথে মোড়া গদিআঁটা চেয়ারখানা যেন আস্তে আস্তে মাটির দিকে নেবে আসচে। চেয়ারগুলিও এত ঘিচি-ঘিচি কোরে বসানো যে একজনের কনুই আর একজনের ঘাড়ে টক্কর লাগায়। তারপর, কখনো যদি আসন ছেড়ে একটু উঠে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তখন সেই আসন-শ্রেণীর মাঝখানকার সরু পথটা দিয়ে চল্‌তে হোলে কর্‌তে হয় জুজুৎসুর কস্‌রত!

মাটিতে বসার একটা মস্ত আরাম এই যে পা ছড়িয়ে বসা যায়। বাঙ্‌লা প্রেক্ষাঘরে চেয়ারে বসাটা স্বার্থপরতা সংশোধক হোতে পারে, কিন্তু একটুকুও আরামজনক নয়। যে-ভাবে চেয়ারে ব'সে নাটক দেখতে হয় তাতে আমাদের শারীরিক কষ্টটাই হয় বেশী; এর ওপর ছারপোকার কামড়-টামড় তো আছেই!

এ-সব অবিশ্যি অতি সামান্য সামান্য খুঁটিনাটির কথা; কিন্তু এগুলোরই জন্যে যে প্রেক্ষাঘরের সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতার কত হানি হয় তা আমরা খেয়ালও করি

না। পয়সা খরচ ক'রে নাট্যশালা বানিয়ে রাখ্‌লেই হয় না ; তাকে চকচকে ঝকঝকে রাখ্‌তে হোলে প্রতিদিন সমস্ত খুঁটিনাটির ওপর নজর রাখ্‌তে হয়। একটা কিছু চটকদার জিনিষ তৈরি করবার সময় আমাদের প্রথম-উৎসাহ এবং অযথা পয়সা-খরচের পটুতা অসীম, কিন্তু সেই জিনিষকে বরাবর রক্ষা করার অপটুতারও সীমা নেই। এ-দেশের দর্শকের যেমন প্রেক্ষাঘরের আসবাব-পত্র-সরঞ্জামের ওপর কোনো দরদ নেই, কর্ত্তৃপক্ষদেরও তেমনি কোনো যত্ন নেই।

কারণ : আমরা এখনো প্রেক্ষাঘরকে নিজের বাড়ীর মতো ভালোবাসতে শিখিনি, রঙ্গালয়ের কর্ত্তারাও ঘরটাকে একটা এজমালী ও বারওয়ারী ব্যাপারের মতো বরাবর অবহেলা ক'রে আসচেন। দোষ দু'পক্ষেরই। কিন্তু নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষরা যদি একটু যত্ন নেন তবে দর্শকদের অভ্যাস ও রুচি খুব সহজেই বদলে দিতে পারেন। নিউ এম্‌পায়ার্‌ থিয়েটারের প্রেক্ষাঘরের সঙ্গে বাঙলা থিয়েটারের প্রেক্ষাঘরের তুলনা করে ফল নেই ; কেননা এ-দুটোর দর্শক ও তত্ত্বাবধায়কদের অভ্যাস, রুচি এবং ব্যবহার সম্পূর্ণ আলাদা। যদি বিলিতি প্রেক্ষাঘরই আমাদের আদর্শ বলে সাব্যস্ত হোয়ে থাকে, তবে তার চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত ক'ল্‌কাতাতেই র'য়েচে। তবে দেশী প্রেক্ষাঘর পয়সার অভাবে বিলিতি প্রেক্ষাঘরের মতো সুসজ্জিত ও চিত্তাকর্ষক নয় বলেই যে সবাই একজোট হ'য়ে বাঙ্‌লা থিয়েটারকে জগু বাবুর বাজারে পরিণত ক'রে তুল্‌বো তার কী কোনো অর্থ আছে ?

রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্য, পট ইত্যাদি বিষয়ে আমরা বিদেশীয় থিয়েটারের যতই অনুকরণ করিনা কেন, প্রেক্ষাঘরকে

বাঙালীর বিশিষ্ট রুচি ও সভ্যতার অন্তর্গত ক'রে গড়ে তুলতে কিছুতেই আমরা পারবো না ততদিন যতদিন না আমাদের স্বভাব বদ্‌লায়।

শ্রীভরতের "ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র" প্রাচীন গ্রন্থে দেশোপযোগী প্রেক্ষাঘর-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা র'য়েচে। শ্রীভরত প্রেক্ষাঘব অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিতে তৈরী করবার উপদেশ দিয়েচেন; সন্দেহ নেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঘর আধুনিক ইউরোপীয় প্রেক্ষাঘবের চাইতে এদেশের পক্ষে বেশী উপযোগী। কিছুদিন আগে একজন জার্ম্মণ্‌ প্রত্নতাত্ত্বিক, ডক্টর্‌ ব্লোখ্‌ রামগড় পাহাড়ের কাছে শিরগুজা নামক একটি স্থানে বহু প্রাচীন একটি প্রেক্ষাঘরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছিলেন, ডক্টব্‌ ব্লোখের মতে এই প্রেক্ষাঘরটি প্রাচীন গ্রীক্‌ আদর্শের অনুপ্রেরণায় নির্ম্মিত। তা যা হোক্‌, যতদূর মনে হয় এর কোনো ছাদ ছিল না। প্রাচীন ভারতে বোধহয় উন্মুক্ত প্রেক্ষাঘরেরই বেশী প্রচলন ছিল। শিরগুজায় আবিষ্কৃত এই প্রেক্ষাঘবটিতে বসবার স্থান ছিল পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা এবং আসন শ্রেণী ছিল অর্দ্ধচন্দ্রাকার।

যাঁরা আজকাল বাঙ্‌লা দেশে নতুন-নতুন রঙ্গালয় স্থাপনের চেষ্টায় আছেন তাঁরা যদি প্রাচীন ভারতের এই পদ্ধতি কিছু কিছু অনুসরণ ক'রতে চেষ্টা করেন তবে বাঙ্‌লা নাট্যশালা থেকে আজকালকার রঙ্গমঞ্চ-সম্পর্কিত ব্যাপারে ইউরোপের অর্থহীন অনুকরণের পরিবর্ত্তে খাঁটি মৌলিকতা আসবে। যে কোনো বাস্তু-শিল্পীকেই জিজ্ঞেস ক'রলে সে বোলবে যে, অল্পপরিসরের ভেতরে, অথচ ঘেঁসাঘেঁসি না

ক'রে, বেশী লোকের বসবার ব্যবস্থা করা চন্দ্রাকারেই সবচেয়ে বেশী সুবিধে। কম পয়সার টিকিটের আসনে, পেছনে বসে, ভালো শুনতে না পেয়ে গোলমাল করে এরূপ দর্শকের সংখ্যা বাঙ্‌লাদেশে বড় কম নেই। অভিনয় কালে প্রেক্ষাঘরের সামান্য বিশৃঙ্খলা ও শব্দেই যে দর্শকের বিরক্তি ও নাটকের রসভঙ্গ হোয়ে যায় তাতে আর কোনো ভুল নেই। কিন্তু মাথা নেই, তার আবার ব্যথা!

টুটা-ফুটা

এদেশে প্রাচীন যুগে নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোতো কিনা এবং হোলেও কী ভাবে হোতো সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। অনুমানে অবিশ্যি বলা যেতে পারে যে, কালিদাস বা ভবভূতির নাটকের অভিনয়োপযোগী স্থায়ী কিম্বা অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ধরণের কিছু একটা ব্যবস্থা হয়তো ছিল এবং তাতে দৃশ্য, পট ইত্যাদি বোধ হয় ব্যবহৃত হোতো।

বাঙলা দেশে, বর্তমান যুগে, যে-ধরণের রঙ্গমঞ্চের প্রচলন, তাতে পুরাকালের ভারতের চিত্রকলা, বাস্তুশিল্প কিম্বা স্থাপত্য-প্রণালীর বিশেষ কিছুই আভাস পাওয়া যায় না। বাঙলা থিয়েটারে নতুন ফ্যাসানের রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব হোয়েচে ইংরেজের আমোল থেকে; এবং তারপর তাকে বিদেশীয় রঙ্গমঞ্চের অনুরূপ ক'রে তোলারই চেষ্টা বরাবর হোয়ে এসেচে। এটা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয়; কেননা, বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্প-সাহিত্যের আদর্শেই বাঙলা দেশের আধুনিক ও নাটক-সম্পর্কিত বেশীর ভাগ জিনিস গ'ড়ে উঠেচে।

যাত্রা ইত্যাদির অভিনয়ের জন্য কোনো দিনও রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হয় নি, আজও হয় না। আধুনিক থিয়েটারের ধরণ-ধারণ যদিও আজকাল যাত্রাতে অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষভাবে পোষক-পরিচ্ছদ ও অভিনয়-

রীতিতে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ ব্যতিরেকে অভিনয় করাটাই বরাবর যাত্রার বিশেষত্ব। যাত্রার নিছক আনন্দ ও উপভোগ্যতা র'য়েচে দৃশ্য-পটের সাহায্য না নিয়ে অভিনয়-সফলতার মধ্যেই। কেবল বাঙ্‌লা দেশে কেন পৃথিবীর আরো অনেক দেশে রঙ্গমঞ্চ ছাড়া নাটকের অভিনয় আজকালও হোয়ে থাকে—যেমন জাপানে, গ্রীসে, স্পেইনে, সিসিলিতে, যদিও আধুনিক যুগে রঙ্গমঞ্চ অধিকাংশ সভ্যজাতির-ই নাট্য-শালার অপরিহার্য্য উপকরণ হোয়ে দাঁড়িয়েচে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় রঙ্গমঞ্চকে বাস্তবতার দিক্ দিয়ে নিখুঁত ক'রে তোলার চেষ্টা অনেক হোয়েচে, এখনো হোচ্চে। সে-দেশের মঞ্চশিল্পীরা কোনো দিক্ দিয়ে কোনো ফাঁক ও অসম্পূর্ণতা যাতে না থাকে সে-চেষ্টা সর্ব্বদাই ক'রে থাকেন। তাঁদের অর্থের যেমন অনটন নেই, তেমন উদ্ভাবনী-শক্তি কিম্বা কার্য্যকারী বুদ্ধির-ও অভাব নেই। বিলিতি রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে ও আওতায় যে-হেতু আধুনিক বাঙ্‌লা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ পরিকল্পিত হোয়েচে, সে-হেতু দুইয়ের মধ্যে তুলনা ক'রে কিছু বল্‌লে সেটা সমীচীনই হবে।

যাদের আদর্শে আমরা আমাদের রঙ্গমঞ্চ তৈরি ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রেচি ও এখনও ক'রচি, এবং অভিনয়-সংক্রান্ত সকল ব্যাপারেই আজ আমরা যাদের রীতিনীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করার সফল অথবা ব্যর্থ প্রয়াস ক'র্‌চি, তাদের ও আমাদের রঙ্গমঞ্চের অবস্থা ও ব্যবস্থার ভেতরে কোথায়, কী বিভিন্নতা আছে সেটা একবার তলিয়ে দেখা আমাদের উচিত।

বিলিতি ধরণের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যাদের চাক্ষুষ পরিচয়

হোয়েচে, তাদের চোখে বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চের বিসদৃশতা ও ত্রুটিগুলি বড়ই বিশ্রী লাগে। পয়সার অভাবে বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চের যে-সব ত্রুটি র'য়েচে এবং হয়তো আরো কিছুদিন থাকতে বাধ্য সেগুলির কথা বলচি না; যে সব ত্রুটি অনভিজ্ঞতা, উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিকল্পনা-পটুতার অভাব প্রতিদিন লক্ষ্য ক'বচি, সেগুলিব কথা-ই এখানে বলবো।

প্রথম অবস্থায় যা-ই থাকুক, অন্ততঃ এই যুগে, পাশ্চাত্য দেশের রঙ্গমঞ্চ থেকে, আমবা যাকে চিত্রিত দৃশ্যপট বলি, সে-সব জিনিষ একেবারে উঠে গেচে। সাধাবণতঃ, ঐ দৃশ্যপট ব'লতে আমরা বুঝি ক্যান্‌ভাসেব ওপর অঙ্কিত নাট্যোল্লিখিত ঘটনা ও অবস্থাব বিস্তৃত প্রতিকৃতি: যা থেকে পাত্র-পাত্রীদেব স্থান, কাল ও অবস্থিতির একটা কাল্পনিক ধারণা আমরা ক'বৃতে পারি: এক কথায় কুশীলবের পেছনে ও দুপাশে যে-সব পটাঙ্কিত চিত্র অধিকাংশ সময় রঙ্গমঞ্চে টাঙিযে দেওয়া হয়।

প্রথম অবস্থায় আমরা ওঠানো-নাবানো-যায এরূপ দৃশ্যপটই ব্যবহার ক'রেচি, এমনকি আজকালও অনেক সময়েই করি; কিছুদিন পরে, মাঝখানে-কাটা, দুপাশ-থেকে-এসে-জোড়া-লাগে এরূপ অপেক্ষাকৃত পুরু দৃশ্যপট ব্যবহার ক'বেচি; এবং হালে, কখনো কখনো, যাকে বলে বাস্তব দৃশ্যপট, অর্থাৎ ঘব, বাড়ী, দেওযাল, কোঠা, জানলা, দরজা, সিঁড়ি—সব কিছুর সচরাচর রূপ রঙ্গমঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে কিছু কিছু চেষ্টা ক'রেচি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বাঙ্‌লা দেশে এমন একখানা নাটকও অভিনীত হয়নি যেখানা পুরোপুরি

ভাবে শেষোক্তরূপে, অর্থাৎ বাস্তুশিল্পানুযায়ী ক'রে প্রযোজিত হোয়েচে। কোনো কোনো দৃশ্যকে বাস্তব ক'রে দেখানোর ব্যবস্থা হোয়েচে, কিন্তু আর বাকীগুলিতে পার্শ্বপটিকা ও মাঝখানে-ভাগ-করা পটেরই সাহায্য নেওয়া হোয়েচে; নয়তো সেই পুরোণো ধরণের নিছক চিত্রিত পটের চিরাভ্যস্ত অসংখ্য পরিবর্ত্তনই তাতে লক্ষ্য করেচি।

. বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চে বাস্তুশিল্পের বাস্তবতা পুরোপুরি ভাবে প্রবর্ত্তন করা কখনো সম্ভব হবে না, যতদিন পর্য্যন্ত না বাঙ্‌লা থিয়েটারে দুটো জিনিষের আমূল পরিবর্ত্তন হয়: প্রথমতঃ বাঙ্‌লা সব নাটকগুলিই অত্যন্ত লম্বা; দ্বিতীয়তঃ বাঙ্‌লা নাটকের নির্দ্দেশিত স্থানগুলি বহু জায়গায় ছড়ানো; সে সব নাটকে সময়ের পরিধি অত্যন্ত বড় এবং অবস্থাগুলিও কেন্দ্রীভূত নয়। বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চ বাস্তুশিল্প অনুসারে নির্ম্মিত হোতে হোলে বাঙ্‌লা নাটকের অসংখ্য পটপরিবর্ত্তনের প্রথা বন্ধ ক'রতে হবে।

কারণ, আধুনিক যুগে পাঁচ অঙ্কের নাটক একরকম অচল বল্‌লেই চলে। খামোখা নাটকের বহর বাড়ালে মঞ্চশিল্পীর-ই অসুবিধা হয় সব চেয়ে বেশী। বাঙ্‌লা নাটককে সংক্ষিপ্ত করে অথচ জোরালো রেখে, অভিনয়কে কী কী উপায়ে নিখুঁত ক'রে তোলা যায় সে-কথাই আমাদের এখন ভাবা উচিত্। নাটক ছোট না হোলে তার প্রয়োজনীয় আসবাব ও সরঞ্জাম নির্ম্মাণ করে ওঠা যায় না; চিত্রিত পট ব্যবহার করলে অসংখ্য বার সরানো-বদলানোর হাঙ্গামাই বেশী। তা রঙ্গমঞ্চ ঘূর্ণমানই হোক্, কী মামুলীই হোক্।

বাঙ্‌লা থিয়েটারে যখন থেকে কিছু কিছু পরিমাণে বাস্তুশিল্পপদ্ধতি অনুসরণের লক্ষণ দেখা গেলো তখন অনেকেই বোধ হয় মনে করেছিলেন যে, যাহোক্ হালে আর একটা কিছু অভিনব ব্যাপার ঘটলো। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে যে অভিনবত্ব বিশেষ কিছুই নেই, খুব সম্ভবতঃ সে-কথা খুব কম লোকেরই তখন মনে হোয়েছিল। বাস্তুশিল্প ছাড়া যে উঁচুদরের রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হোতেই পারে না, বহুদিন পর্য্যন্ত সে-কথা আমাদের মনেই হয়নি; এবং আজও যে আমরা এ-বিষয়ে খুব সচকিত তারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

যাত্রার কায়দা-কানুন ছেড়ে দিয়ে দৃশ্যপট ব্যবহার ক'রতে আরম্ভ করার পর থেকে আমরা এই দৃশ্যপটযুক্ত রঙ্গমঞ্চ জিনিষটাকেই নাট্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা ব'লে এদেশে ধ'রে নিয়েচি। হরেক রকমের দৃশ্যপট চিত্রিত ক'রতে গিয়ে আমরা কত পয়সাই না খরচ করলুম, আর বিচিত্র ঢং-এর চিত্র দিয়ে তাকে কতই না সাজালুম; কিন্তু এতকাল ধরে রঙ্গমঞ্চের সত্যিকারের বাস্তব রূপটি আর কিছুতেই পরিস্ফুট ক'রতে পারলুম না আমরা। কেন পারলুম না তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারও বোধ করিনি: কোনো জিনিষকে তলিয়ে দেখে তার আসল তাৎপর্য্য আবিষ্কার ক'রতে হোলে সময় লাগে, ধৈর্য্য লাগে, শিক্ষাও লাগে। নাটক-সম্পর্কিত ব্যাপারে রঙ্গমঞ্চের জিনিসটা যত সহজ মনে হয় তত সহজ যদি হোতো তাহোলে আর ভাবনাই ছিল না।

চিত্রিত পট ও বাস্তুশিল্প নির্ম্মাণের ভেতর প্রভেদ এই যে, বাস্তুশিল্পের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থূলতা আছে; কিন্তু চিত্রপটের

আছে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ; চিত্রের আয়তন নেই, গভীরতাও নেই। মানুষ-ও বাস্তশিল্প-নির্ম্মিত জিনিসের মতো তিন আয়তন বিশিষ্ট; তারও দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থূলতা র'য়েচে। কাজেই, খাঁটি বাস্তবতার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে চিত্রিত দৃশ্যপট বা পার্শ্বপট, যে-মানুষ রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করবে, তার পক্ষে অত্যন্ত বেমানানসই ও খাপছাড়া হোয়ে পড়ে।

একমাত্র বাস্তশিল্পে-গড়া জিনিষের সঙ্গেই ও মাঝখানেই অভিনেতার যথার্থ সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি হোতে পারে: যে-জিনিষগুলি পেছনে ও পাশে রেখে ও যে-জিনিষগুলির মাঝখানে অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াবে, সে-জিনিষগুলিও যদি তিন আয়তনবিশিষ্ট ক'রে না দেখানো হয়, তবে মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতরে যে-মিলটা আমরা সর্ব্বদা বাস্তব জীবনে দেখতে পাই সেই মিলটা রঙ্গমঞ্চে আর থাকে না।

কাজেই, চিত্রিত দৃশ্যপটের ভেতর দিয়ে রঙ্গমঞ্চে পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তব চিত্র কিছুতেই ফুটে ওঠা সম্ভব নয়। সেই কারণে, পাশ্চাত্য দেশের রঙ্গমঞ্চে আজ উন্নত সভ্যতার যুগে চিত্রিত পটের কোনো স্থান নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন, আপনার বাড়ীর একটা কোঠা এবং সঙ্গে-সঙ্গে কল্পনা করুন আপনার সেই কোঠাখানার একটা পটে-আঁকা ছবি। এই কোঠাটী ছুতোর দিয়ে রঙ্গমঞ্চের ওপর অবিকল বানিয়ে নিলে সে-সম্বন্ধে যে প্রাঞ্জল ও চাক্ষুষ জ্ঞান আপনার হবে সেরূপ কী তার পটে অঙ্কিত চিত্র দিয়ে কখনো হোতে পারে?

চর্ম্মচোখে আমরা বিশ্বচরাচরে যে-সব বস্তু দেখতে পাই,
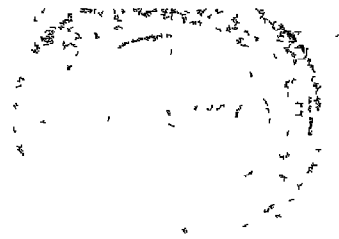
সবই আয়তনবিশিষ্ট ; রঙ্গমঞ্চকে যদি মানব জীবনেরই হুবহু প্রতিকৃতি ব'লে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে নাটকাভিনয়ে মানুষের নিছক বাস্তব রূপ—তার হাব-ভাব, কথা, চলা-ফেরা ইত্যাদির সত্যিকার অভিব্যক্তি দেখতে যেমন আশা করবো, তেমনি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থারও নিছক, প্রত্যক্ষ রূপটি-ও দেখতে প্রত্যাশা করবো। সুতরাং, রঙ্গমঞ্চে মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিত্রিত পট দিয়ে দেখানোর চেষ্টা বাঙ্‌লা দেশে এখন থেকে যত কম হয় ততই ভালো।

আমাদের মঞ্চশিল্পীদের এখন থেকে সর্ব্বতোভাবে বাস্তু-শিল্পেরই সহায়তা গ্রহণ ক'রতে হবে : যে-জিনিষটাকে ইউ-রোপের লোকেরা 'প্লাস্‌টিক্' আর্ট বলে। সে-দেশের মঞ্চশিল্পীরা ঘর, বাড়ী, আসবাবপত্র, সর্ব্ববিধ দ্রষ্টব্য বস্তুই রঙ্গমঞ্চের উপরে নির্ম্মাণ করিয়ে নেয়। উদাহরণ স্বরূপ, সে-দেশের লোক নিজেদের বাড়ীতে যেরূপ ঘরে বসে, শোয় ও খায়, রঙ্গমঞ্চেও তারা সেরূপ বসবার, শোবার ও খাবার ঘর দেখতে চায়। সে-দেশে বাস্তুশিল্প-নির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চের বাহ্যিক উপকরণগুলি বিভিন্ন অবস্থায় আলো ও ছায়াপাতের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় লোক-চক্ষুর কাছে আরো বাস্তব ও সজীব হোয়ে ওঠে।

কোনো প্রযোজকের নির্ম্মাণ-ভঙ্গী নাটক বিশেষের প্রয়োজন অনুসারে হয়তো বিভিন্ন আকৃতি ধারণ ক'রতে পারে, কিন্তু সেটা পুরোপুরিভাবে বাস্তুশিল্প-ই হোতে হবে। বাঙ্‌লা দেশে যাঁরা রঙ্গমঞ্চের উন্নতি ক'রতে চেষ্টা ক'রচেন, তাদের উচিত পাশ্চাত্য মঞ্চ-শিল্পীদের রীতি-নীতি, পদ্ধতি এবং তাদের প্রযোজনায় ও প্রভাবে অভিনীত নাটকগুলির

বিশেষত্ব কী ও কিসের জন্য, সে-সব খুব ভালো ক'রে বুঝতে চেষ্টা করা।'

এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার উপযোগী বিস্তর বই ও চিত্রলিপি পাওয়া যায়। একটা নতুন কিছু করবার জন্যই বা বাহ্যিক চটকদারী দিয়ে দর্শকের মন ভোলাবার চেষ্টা নিতান্তই ছেলেমানুষি; বাঙ্‌লার রঙ্গমঞ্চশিল্পের উন্নতি করতে হোলে চিত্রিত দৃশ্যপট একেবারে তুলে দিতে হবে এবং বাস্তব কারু-শিল্পেরই আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং রঙ্গমঞ্চ এ দু'এর ভেতরে বাস্তবতার মিল ও সামঞ্জস্য না আনতে পারবো, ততদিন- বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র দৃশ্যপট শোভায় যতই শোভিত হোক্ না কেন, যতবারই তা রিহ্বলহ্বিং কাঠামোর উপর ঘুরুক্ না কেন, সেটা অসার, প্রাণহীন ও কৃত্রিমই থেকে যাবে।

যাদৃশী সাধনা যস্য

মস্কো আর্ট্ থিয়েটার বোলতে ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কিকেই (Stanislavsky) বোঝায়। কেননা, ঐ থিয়েটারের ইতিহাস ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কি-র জীবন-ব্যাপী নাট্য-সাধনারই ইতিহাস। জীবন-ব্যাপী নাট্য-সাধনা জিনিষটা কী, তার তাৎপর্য্য বা মূল্য-ই বা কী, তা আমাদের দেশের অনেকেই ঠিক অনুমান ক'রতে পারেন ব'লে বিশ্বাস করি না; তাব কারণ যাই হোক্ তাদের এই অক্ষমতার জন্য অজুহাত অবিশ্যি অনেক শুনতে পাই।

সে কথা যাক্। কেবল রাশ্যাতে নয়, বিংশ শতাব্দীতে, গোটা ইউরোপে, নাট্য-শিল্পের যে পরিবৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি তার পেছনে যাঁদের সাধনা রয়েচে তাঁদের মধ্যে ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কি শুধু অন্যতম নন, শ্রেষ্ঠ। অবিশ্যি সোভিয়েট্-যুগে রাশ্যান্ থিয়েটারে নতুন অনেক কিছু হোযেছে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে অভিনয়-প্রণালীতে ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কির প্রবর্ত্তিত প্রথা আজও প্রচলিত। বল্শেভিস্ট্ থিয়েটারের সবচেয়ে নামকরা নাট্য-পরিচালক হোচ্চেন মাইয়ারহোল্ট্ (Meyerhold); তাঁর প্রধান চেষ্টা হোচ্চে নাটকের ভেতর দিয়ে অজ্ঞ ও স্বল্প-জ্ঞানী জনসাধারণকে সোভিয়েট্-তন্ত্র ও তার গুণাবলী বোঝানো। নাটককে প্রপাগ্যাণ্ডিষ্ট্ রূপ দিতে গিয়ে মাইয়ারহোল্ট্ চলচ্চিত্রের রীতিনীতি অনেক পরিমাণে অবলম্বন করেছেন; কিন্তু অভিনয় বা মঞ্চ-শিল্পের দিক্ দিয়ে ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কির পদ্ধতিকেই অনুসরণ ক'রে আসচেন।

মস্‌কৌ আর্ট্‌ থিয়েটারে প্রধান অভিনেতা বা অভিনেত্রী ব'লে কেউ কোনো কালেই ছিল না। কোনো নাটকে সামান্য চাকরের ভূমিকাটী যতটা সুস্পষ্ট, প্রধান নায়ক বা নায়িকার ভূমিকাও ঠিক ততটা। সেই জন্যে মস্‌কৌ আর্ট্‌ থিয়েটারের নায়ক-নায়িকাদের কাউকেই বিশেষভাবে প্রশংসা বা নিন্দার যোগ্য ব'লে সাব্যস্ত করা যেমন অসম্ভব তেমনই অপ্রয়োজনীয ছিল। আলাদা-আলাদা ক'রে তাদের বিশেষত্বের বিচার করতে গেলে ষ্ট্যানিস্লাভ্‌স্কির অভিনয়-শিল্পের যথার্থ মূল্য বুঝতে পারা যায় না। তাদেব প্রত্যেকের চলা-ফেবা, হাব-ভাব, এমনকি ঠোঁটের আকৃতি ও কণ্ঠ-স্বর পর্য্যন্ত সমগ্র নাটকীয় বক্তব পরিকল্পনার অঙ্গীভূত : তাদের বিশেষত্বের ঢঙ-ও নেই, বালাই-ও নেই। সেই কারণেই ষ্ট্যানিস্লাভ্‌স্কিব নাট্য-শিল্পে যেমন কোনো কিছু খেলো নেই, তেমনি তার কোনো অভিব্যক্তি-ই জোলো ও ভাসা-ভাসা নয়।

ষ্ট্যানিস্লাভ্‌স্কির নাট্য-নির্ম্মাণ একটা পরিপূর্ণ সৃষ্টি; তাতে কোথায়-ও কোনো খুঁত নেই। নাট্য-নির্ম্মাণকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে হোলে কী সব মাল মসলার দরকার তা আমাদের দেশের নাট্য-পরিচালকেরা কী কখনও ভেবে দেখেছেন? তাঁদের পরিচালনা-প্রসূত নাটকগুলির ভেতরে অসঙ্গতির দোষ কেন এত থাকে তা-ও একটু ভালো ক'রে চিন্তা ক'রে দেখেছেন কী? প্রাতঃস্মরণীয় গিবীশবাবু এ-সম্বন্ধে কিছু ভাবতেন কিনা জানি না; কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু আমরা জানি, তা থেকে মনে হয় যে তিনি প্রধান নায়ক বা নায়িকার ভালো অভিনয়ের দিকেই বেশী দৃষ্টি

দিতেন ; তার ফলে, তাঁর নাটকগুলি যতই চটকদার হোক্ না কেন সেগুলি অসম্পূর্ণ র'য়ে যেতো। গিরীশবাবুর আমোল থেকে বাঙ্‌লাদেশে এই টুটা-ফুটা নাটকের-ই বাজারে বেশী কাট্তি।

অবিশ্যি শিশির ভাদুড়ী প্রথম দিকে অভিনয়-সঙ্গতির দিকে কিছু কিছু চেষ্টা করেছিলেন ; নাটকের সামান্য ও তুচ্ছতম ভূমিকা থেকে আরম্ভ ক'রে প্রধান ও বিশিষ্ট ভূমিকা পর্য্যন্ত সবগুলিকেই একটা সমান সমকক্ষতা ও সঙ্গতিতে গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। শেষের দিকে, যে কারণেই হোক, সে-সব প্রচেষ্টা উবে গেচে।

বাঙ্‌লা দেশের প্রায় সব নাট্যশালাতেই এখনও সেই গতানুগতিকতা বর্ত্তমান। গতানুগতিকতাই বাঙ্‌লার রঙ্গ-মঞ্চকে একটা দুঃস্বপ্নের মত চেপে ধরেচে।

ভুরু কুঁচকে-কুঁচকে বাঙ্‌লাদেশের নট-নটীদের কপালের চামড়ায় চিড় ধ'রে গেছে : যেন ঐ ভুরু-কোঁচকানোটাই খুব সাইকোলজিকাল্ অভিনয়! অবশ্যি শিশিরবাবু বাঙ্‌লার নট-নটীদের একটা বড় জিনিষ শেখাতে চেষ্টা করেছেন : সেটা এই যে, নাটকে কোনো কোনো কথা অনুচ্চারিত থাক্‌লেই হয় সব চেয়ে মর্ম্মস্পর্শী, কিন্তু শুধু সেটুকু দিয়েই তো আর সব দিক দিয়ে নাটকের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না।

যাঁরা এ সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করচেন, তাঁদের ষ্ট্যানিস্লা-ভ্‌স্কির *My Life in Art* বইখানা প'ড়ে দেখতে অনুরোধ ক'রচি। কী পদ্ধতি অবলম্বন ক'রলে ও কী প্রণালীতে নাট্য-পরিচালনা ক'রলে অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুষ্ঠু করা যায় সে-সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা তা' থেকে সংগ্রহ ক'রতে

পারবেন। ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কির মস্কৌ আর্ট্ থিয়েটার আজ বিদ্যমান নেই ; কিন্তু ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কির প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি এখনও চল্‌চে : শুধু রাশ্যায় নয়, সমস্ত ইউরোপে।

ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কির জীবন যে ঘটনা-বহুল ও বৈচিত্র্যময় তা কিছুই আশ্চর্য্যের নয়। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ সনে—মস্কৌতে : এক ধনী ব্যবসায়ীর ঘরে। অর্থের জন্য তাঁকে কোনদিন কষ্ট পেতে হয়নি। তাঁর আসল নাম ছিল Alexeiev ; কিন্তু যখন তিনি কুড়ি বছর বয়সে মস্কৌর "Russian Musical Society"-র ডিরেক্টার হোলেন তখন নামটা বদলে পোলিশ্ নাম ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কি নিলেন : তার কারণ, "Musical Director" হিসেবে তাঁর উচ্চাঙ্গের সমাজের ভেতরেই চলা-ফেরা ছিল বেশী ; কাজেই দেখলেন যে ছদ্মনামে ছাড়া তখন-কার দিনের থিয়েটার-মহলে যাওয়া-আসা করা সম্ভব হবে না।

ছেলেবেলা থেকে থিয়েটারের ওপরেই তাঁর বেশী ঝোঁক। এমনকি যখন তাঁর দু'তিন বছর বয়েস তখন কোথায় একটা ঋতু-উৎসবের মূকাভিনয় তিনি দেখেছিলেন : দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সেদিনকার উদ্দীপনা তাঁর মনে অঙ্কিত হোয়ে ছিল। যৌবনে, নাটক-সম্পর্কীয় যাকিছু হোতো তাতেই তাঁর মন আকৃষ্ট হোতো : এমনকি ছোট-ছোট অখ্যাত অভিনয়, অপ্‌রা, ভ্যোডভিল্, ব্যালে, পুতুলনাচ, মায় সার্কাস্ পর্য্যন্ত। তাঁর তখনকারদিনের উৎসাহ ছিল অফুরন্ত ; কিছুই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতো না। ১৮৮৮ সালে তিনি "Society of Art and Literature" নাম দিয়ে মস্কৌতে একটা সাহিত্যিক বৈঠক রচনা করেছিলেন :

লোকে চলতি কথায় ওটাকে "Alexiev Circle" বোলতো।

এই "নাট্যসঙ্ঘ" জিনিষটা ছিল ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কির প্রতিভার সব চেয়ে বড় অংশ। দশ বছর পরে যখন মস্কৌ আর্ট্ থিয়েটার স্থাপন করলেন তখন তার সঙ্গে-সঙ্গে এই সাহিত্যিক বৈঠকের-ই রূপান্তর ক'রে একটা ষ্টুডিও গ'ড়ে তুললেন। এই ষ্টুডিও-ই ছিল মস্কৌ আর্ট থিয়েটারের মেরুদণ্ড: যেখানে বড় বড় প্ল্যানের জন্ম হোতো, যেখান থেকে নব নব নাটকীয় সৃষ্টির উদ্ভাবনা হোতো। এই ষ্টুডিওতে তখনকারদিনের রাশ্যাতে এমন কোনো গুণী ও শিল্পী ছিলেন না, যিনি আসতেন না। মস্কৌ আর্ট্ থিয়েটার স্থাপনাতে তিনি সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছিলেন চেহভের বন্ধু, Dancenko-র কাছ থেকে। এই থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক চেহভের *Sea Gull.*

প্রথম থেকেই ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কির উদ্দেশ্য ছিল রাশ্যার প্রচলিত থিয়েটারের আমূল পরিবর্ত্তন করা, বিশেষভাবে নট-নটীর অভিনয়ের দিক্ দিয়ে; এবং প্রচলিত থিয়েটারে যে-সব দোষ ছিল সেগুলো একেবারে বর্জ্জন করা। ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কি দেখলেন যে, তাঁর বিপ্লব-পন্থী থিযেটারের পক্ষে চেহভের নাটকগুলোই সব চেয়ে বেশী উপযোগী। পাঁচ বছর ধ'রে পর পর চেহভের *Sea Gull, Cherry Orchard, Uncle Vanya, Three Sisters* অভিনয় করালেন। পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বুঝতে পারলেন যে, নাটকের ভবিষ্যৎ র'য়েচে উচ্চ শ্রেণীর নট-নটীদের হাতে, কেবল নাট্যাধ্যক্ষের মস্তিকের কসরতের ওপর নয়।

অভিনয়ের খাঁটি নাটকীয় বস্তুটা নট-নটীদের সহজ, স্বচ্ছন্দ লীলায়িত অভিব্যক্তি দিয়ে ছাড়া ব্যক্ত হোতে পারে না। তাদের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গী, প্রতিটি বাক্য-বিন্যাস সহজ, সাধারণ ও প্রাত্যহিক হোতে হবে; তাতে বিশেষত্বের আবর্জ্জনা থাকবে না: তারা সঙ্গীত-সঙ্গতির মতো সমবেত ভাবে আত্মপ্রকাশ কোরবে; তারা হবে জ্যান্ত মানুষ; অদল-বদল করা বা সাজ-গোজ বদলানোর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর তারা আট্‌কে থাকবে না। বাঙ্‌লা দেশের পাঁচ-মিশেলী নট-নটীর পক্ষে কী এ রকম হওয়া কোনোদিন সম্ভব হবে?

থিয়েটার নিয়ে দেশ-বিদেশে অভিনয় ক'রে ফেরবার সঙ্কল্প যখন ষ্ট্যানিস্লাভ্‌স্কির মাথায় এলো, তখন তিনি চেহভ্‌ ছাড়াও অন্য রাশ্যান্‌ নাট্যকারদের 'ধরলেন—পুস্‌কিন্‌, অষ্ট্রভ্‌স্কি, গোগোল, তুর্‌গেনিয়েভ্‌, টল্‌ষ্টয়, গোর্কী, দস্তায়েভ্‌স্কি, আন্দ্রেয়িয়েভ্‌ এবং বিদেশীয় অনেক নাটকও অভিনয় করালেন: শেইক্‌স্‌পীয়্যর্‌, মোলীয়েয়ার্‌, ইব্‌সেন, হাউপ্‌টমান্‌, গোল্ডোনী, প্রভৃতির। কিন্তু সবগুলি নাটকেরই প্রযোজনায় তাঁর যে বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা আগে বলেচি, সেই অনুসারেই সেগুলি অভিনীত হোয়েচে, এবং কোনোদিন তার কোনো ব্যত্যয় হয়নি।

এ কথা যেন কেউ মনে না করেন যে যে ষ্ট্যানিস্লাভ্‌স্কি কেবল নট-নটীর পটুতার দিকেই দৃষ্টি দিয়েচেন, রঙ্গমঞ্চের সৌষ্ঠব ও সুকুমারতায় দিকে কোনো নজর দেননি। রঙ্গমঞ্চকে গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় তাঁর সময়ে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না; কিন্তু তাঁর শিক্ষানুপ্রেরিত ও তাঁর নিজের হাতে-গড়া নট-নটীরাই ছিল তাঁর অভিনয়

কৃতিত্বের চূড়ান্ত নিদর্শন। নট-নটীকে সর্ব্বতোভাবে সুসমঞ্জস কোরে দেখানোর জন্য প্রচ্ছদ-পটের যতটুকু নৈপুণ্যের প্রয়োজন মনে ক'রেচেন তার জন্যে তিনি কোনো দিনই পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

বর্ত্তমান যুগের ইউরোপে মঞ্চশিল্পী হিসেবে ম্যাক্স্ রাইন্হার্টের (Max Reinhardt) সমকক্ষ কেউ আছেন বলে মনে হয় না; অবিশ্যি, রাইন্হার্টের মঞ্চশিল্প সম্পর্কিত পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা বাঙ্লা রঙ্গমঞ্চের বর্ত্তমান অবস্থাতে সহজ নয়, বোধ হয় সম্ভব-ও নয়। কেননা, তদুপযোগী নাটক বাঙ্লা দেশের থিয়েটারে অভিনয় করাতে হোলে বাঙ্লার নাট্যপরিচালকদের নিজেদের প্রথমে অনেক কিছু শিখ্তে হবে তারপর, রাইন্হার্ট্-পন্থা সামান্যভাবে অনুসরণ ক'রতে গেলেও অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু ষ্ট্যানিস্লাভ্স্কির অভিনয়-পদ্ধতি দেশোপযোগী ক'রে অবলম্বন করা খুব কঠিন হবে ব'লে বিশ্বাস করি না। কারণ, যে-প্রকারের বাঙ্লা নাটকই হোক্ না কেন, তার অভিনয়কে একটা পরিপূর্ণ সৃষ্টি ক'রে তোলা এবং সেই অনুসারে বাঙলার নট-নটীদের গড়ে তোলা পরিশ্রম ও শক্তি-সাপেক্ষ। আর, বাঙ্লা রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্য ষ্টুডিও ধরণের কিছু একটা স্থায়ী সম্মিলনী তার ভেতর সংস্থাপন করা-ও খুব কষ্টসাধ্য নয়; আপাততঃ ইচ্ছারই অভাব দেখ্‌চি। এই ষ্টুডিও যে কেবল নাটুকে লোকদেরই আড্ডা হবে তা নয়: সেখানে নাট্য-হিতৈষী, দেশের গুণী ও মনীষীদের যাতায়াত ও প্রভাব থাকবে। তা হোলেই বাইরের আবহাওয়া এসে বাঙ্লা রঙ্গমঞ্চের গতানুগতিক কুসংস্কার ও অন্ধ সঙ্কীর্ণতাকে পরিস্কৃত কোরতে পারবে।

ব্যাবিটের রূপ

নোবেল্-পুরস্কার পাওয়ার পর সিন্‌ক্লেয়ার্ লুঈসের ব্যক্তিগত গৌরব যতখানি হোয়েচে তার চেয়ে অনেক বেশী গৌরব হোয়েচে বোধ হয় আমেরিকার। কেননা, আধুনিক আমেরিকার সাহিত্য এর আগে ইউরোপের কাছে এত বড় সম্মান পায় নি। এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই, কারণ, আমেরিকার সাহিত্য এখনও শিশু: তার বড়-হওয়ার দিন এখনও আসে নি। উচ্চাঙ্গের শিল্প-সৃষ্টির কষ্টি-পাথরে পরখ্ কর্‌লে তার যেটুকু মূল্য দাঁড়ায় সেটুকু ঐ শিশুর সহজ, চঞ্চল ও চিন্তাহীন সৌন্দর্য্যের-ই মূল্য।

অবিশ্যি, আমেরিকার সাহিত্যের দরবারে সমঝ্‌দারদের কাছে শূদ্র-সাহিত্য বা অভিজাত-সাহিত্য ব'লে কোনো ভেদাভেদ নেই; ইউরোপে আছে। বহুযুগের সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফলে ইউরোপের সাহিত্যে একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি তৈরী হোয়েচে, সেটা শুধু খামখেয়ালির সৃষ্টি নয়: সেটা পাকা, মজবুত ও পোক্ত। ইউরোপের সেই মাপকাঠির মাপে আমেরিকার নব্য কথা-সাহিত্য মানানসই হোয়েচে সেটা যে একটু আশ্চর্য্যের বিষয় তা মান্‌তেই হবে।

সিন্‌ক্লেয়ার্ লুঈসের উপন্যাসের আখ্যান-বস্তুতে কোনো একটা বৃহৎ জগতের চিত্র আমরা পাই না: সবই সাম্প্রদায়িক ও অসার্ব্বজনীন: ছোট-ছোট শহরের ছোট-ছোট গণ্ডীবদ্ধ, মানবজগতের কাহিনী, নগণ্য নর-নারীর অগণ্য

ঠুন্‌কো বাহাদুরী, বিলাসিতা, নিষ্কর্ম্মণ্যতা, অন্ধ গোঁড়ামী ও অশ্লীলতা।

লুঈসের কোনো গল্পেরই ঘটনা জমকালো ও জোরালো নয়; লুঈসের লিখন-ভঙ্গীতে অসাধারণত্ব-ও কিছু নেই। বর্ণনার ভেতরে না আছে কারুকার্য্য, না আছে পরিকল্পনার পটুতা: কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর ঘটনার অসংবদ্ধ বিবৃতি, কতকগুলি যেখানে-সেখানে-দেখ্‌তে-পাওয়া মেয়ে-পুরুষের চিরাভ্যস্ত পানাহার, হাসি-কৌতুক ও ছ্যাব্‌লামির কথা।

অবিশ্যি প্রশ্ন হবে এই যে, এই ধরণের লেখক ইউরোপের সাহিত্য-সমাজে উচ্চ সম্মান কী ক'রে পেলেন এবং কেনই বা পেলেন? এর একমাত্র উত্তর এই যে, সিন্‌ক্লেয়ার্‌ লুঈসের কথা-সাহিত্য অপরিণত-বয়স্ক নব্য-আমেরিকারই সত্য ইতিহাস: সে-দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিল্প-কলা, ধর্ম্ম—এক কথায় আমেরিকার জোলো কাল্‌চার ও খেলো সভ্যতারই নিখুঁত চলচ্চিত্র তাতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আর্ট্‌ হিসাবে তা উঁচুদরের নাই বা হোলো; কিন্তু লুঈস্‌-সাহিত্য যে জীবন্ত, বাস্তব, চঞ্চল নব্য-আমেরিকার প্রতিকৃতি স্বরূপ, তাতে আর কোনো ভুল নেই।

লুঈসের নর-নারীরা কেবল বাইরের পোষাক-পরিচ্ছদে-মোড়া প্রাণ-শূন্য কতকগুলি মোমের পুতুলের মতো নয়; তাদের ভেতরে জীবনীশক্তির স্পন্দন আছে; তাদের গতি আছে, যদিও বা সবসময় তাতে ছন্দ না থাকে। তাদের জীবন ঐ এক অসমছন্দের বে-সামাল পা-ফেলে চলা—বেজুত, নড়-বড়ে, অচৈনিক। তাদের হাসি ফেনার মত ফিন্‌ফিনে; তাদের

কান্নায় করুণতার কার্পণ্য নেই। তাদের ব্যঙ্গ-কৌতুক যেন তাদের ঐ সস্তা 'চিউইং-গামের' মতোই চ্যাট্-চ্যাটে, কিন্তু তারা বেঁচে আছে। তাদের দুর্দ্দমনীয় জীবন-স্পৃহার কোথায়ও একটু ফাঁক নেই : যেন জমাট, ঠাসা।

আমেরিকার এই রূপ-ই তো সত্য রূপ ; এ রূপ তারা স্কাই-স্ক্রেইপারের ঔদ্ধত্য দিয়ে ঢেকে দিতে পারেনি, 'জ্যাজের' বিকৃত চীৎকার দিয়েও তলিয়ে দিতে পারেনি। নব্য-মার্কিনবাসীদের এই সত্যিকারের রূপটী সিন্‌ক্লেয়ার্ লুঈসেব কথা-সাহিত্যের ভেতর দিযে তাই আজ ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেচে। এই ধবণের সাহিত্য-সৃষ্টি দিযে বিশ্বেব মন জয় কবা, এই বোধ হয় প্রথম।

আজ পর্য্যন্ত সিন্‌ক্লেযাব্ লুঈসের যে ক'খানা উপন্যাস বেরিযেচে তার ভেতব উল্লেখযোগ্য : *Main Street, Babbitt, The Job, Martin Arrowsmith* ও *Elmer Gantry.* আলাদা ক'বে প্রত্যেকটা বই বিচার ক'বলেও লেখকের মূল্য হ্রাস হবে না ; কেননা, প্রত্যেকখানাই আমেবিকার ব্যক্তিগত বা সমাজগত জীবনের কোনো একটা বিশিষ্ট দিকেব আলাদা, অথচ পরিপূর্ণ ছবি।

Main Street আমেবিকার সহস্র ছোট শহবের মতোই কোন-ও একটা শহরেব ছবি ; কাজেই, এ বইখানা পডলে আমেরিকার ঐ ধবণের সব ছোট শহরেরই ধারণা করা যায়। উপন্যাসের প্রধান নাযিকা এক ভাববিলাসী, হাতুডে ডাক্তারের স্ত্রী ; তার হৃদয়, আত্মা, বা মনোজগত ব'লে কোনো কিছু নেই, আর ও-সব জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাবারও তার সময নেই : তাব আছে শুধু একটা

ব্যবহারিক জীবন এবং সে-জীবনের পরিসর-ও ঐ ছোট *Main Street* এর সমাজটুকুরই ভেতরে।

সিন্‌ক্লেয়ার্‌ লুইসের অন্য উপন্যাসগুলোও ঐ একই ছাঁচে ঢালা; তাতে গল্পের অংশ খুবই কম, আর যেটুকু গল্প আছে তা-ও অসংবদ্ধ, ছাড়া-ছাড়া। তাতে আছে নায়কের কেবল সহস্র তুচ্ছ কোঁদল, সহস্র তুচ্ছ, আমার্জ্জিত হাস্য-পরিহাস। এ মানুষগুলোর আছে শুধু প্রবৃত্তি এবং রক্ত-মজ্জা-মাংসপেশীর প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় তাড়না। এমনকি যৌন-সম্পর্কের মতিচ্ছন্নতা বা চিত্তবিক্ষেপও তাদের নেই; কেননা, তারা সবাই 'ব্যবিট্' শিশু-আমেরিকান; তাদের যেমন বাধা নেই, বোধও নেই। তাই তাদের জীবন-সূত্রে কোনো আগাগোড়া মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, তাদের ভাবজগৎ ব'লে যদি বা কিছু থাকে, তার সঙ্গে তাদের বহির্জগতের কোনো সম্পর্ক নেই।

সিন্‌ক্লেয়ার্‌ লুইসের এই-'ব্যাবিট্'কে একবার চিন্‌লে ও বুঝলে গোটা আমেরিকাকে চেনা যায়, বোঝা যায়। ব্যাবিট্ আমেরিকার প্রতীক, তার দেহ এবং মনের শতাংশের প্রত্যেকটী অংশই পুরোপুরি আমেরিকান্। সে ইউরোপের মানুষের মত বহুরূপী নয়: তার ঐ এক রূপ, সেই ব্যাবিটের রূপ।

এ-ব্যাবিট্ জীবন ভ'রে ছোট জিনিষেরই পূজা ক'রে এসেচে, ছোট জিনিষেই লিপ্ত হোয়ে আছে। তার অতীতের ভাবনা নেই, ভবিষ্যতেরও ভয় নেই, সে জানে শুধু বর্ত্তমান: সে বোঝে শুধু প্রতিদিনকার ব্যবহারিক জীবনের ছোট-খাটো দাবী-দাওয়া। সে জীবন-রহস্যের

ধার ধারে না: সুখ-দুঃখ, সাফল্য-নিষ্ফলতা, সব কিছুই সে লাভালাভের নিক্তিতে ওজন ক'রে নিচ্চে: তার কাছে টাকার মূল্য টাকাই: তার চোখে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্কিটেক্চার্ তার শহরেব ব্যাঙ্ক্: তাব কাছে কাল্চাব মানে ফ্রি-লাইব্রেরী ও পাঠাগার।

এ-ব্যাবিটের মনে যদিও বা কখনও জীবনেব রহস্য বা ধর্ম্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন জাগে, সেটাও শিশু-মনেব প্রশ্ন: যেমন, "Did Christ play poker?" এ প্রশ্ন এত হাস্যকর, এত 'নাঈহ্ব্' যে, একে মূর্খতার বিদ্রূপ দিয়েও বোধ হয় অপমান কবা চলে না।

ব্যাবিট্ ক্ষুদ্র ব্যবসাদাব, ক্ষুদ্র ধনী; কিন্তু সে-ই আমেরিকাব সুপার-ক্যাপিটালিষ্টের জন্মদাতা। সে দম্ভে অতুলনীয়; তার হাবভাব অননুকরণীয। সে বেণে নয়, সওদাগবও নয; কারণ তাব ভিতবে বনিয়াদীব হুঁসিয়ারী বুদ্ধি নেই, সওদাগরেব গৃধ্নুতা-ও নেই। সে নাবালক ব'লে তার ভেতরে ব'যেচে একটা সহজ, সরল আদর্শবাদ। সে কেবল নিজেব আর্থিক উন্নতিই চায না; সে চায তার শহরের উন্নতি ও পবিবৃদ্ধি, সে চায এমন সব কিছু যাতে গোটা আমেরিকাব-ই গৌবব বাড়ে; কাবণ, সে মনে করে যে সে-ই ইযাঙ্কি সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পাণ্ডা।

এই ব্যাবিট্ তার অবিচ্ছিন্ন নিছক প্রতিকৃতি নিয়ে বিভিন্ন ঢং-এ, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সিন্‌ক্লেয়াব্ লুঈসের কথা-সাহিত্যে বিবাজ ক'ব্চে: কখনও বৈজ্ঞানিক, জ্ঞান-সন্ধিৎসু মার্টিন্ এবোস্মিথ্ রূপে, কখনও বা ধর্ম্ম-যাজক, বকধার্ম্মিক এল্মার্ গ্যান্ট্রি রূপে। তাদের ওপরের

আবরণ উন্মোচন ক'রে দিলে প্রচ্ছন্ন সেই ব্যাবিটের-ই রূপ বেরিয়ে পড়ে: সেই ব্যাবিট্, সেই নাবালক ইয়াঙ্কি।

সিন্‌ক্লেয়ার্ লুইসের লেখা মোলায়েম নয়; কারণ তার ভঙ্গীটা একটু তীব্র ও ঝাঁঝালো। এই তীব্রতার কারণ বোধ হয় এই যে, যে-সমাজের চিত্র তিনি এঁকেচেন সেই সমাজটার সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর আর্ট প্রতিনিয়তই খর্ব্ব হোয়ে পড়চে, তার পরিপূর্ণ প্রকাশ হোতে পারচে না। তার মানে এই যে, নব্য ইয়াঙ্কি-সমাজের বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি এত গণ্ডীভূত, সাম্প্রদায়িক ও সঙ্কীর্ণ, যে তা উঁচুদরের শিল্প-সৃষ্টির সহায়ক হোতে পারে না। কাজেই, এই সমাজের কুশ্রী উগ্রতা ও ক্ষমাহীন অর্থ ও যশোলিপ্সার অভদ্র, অশ্লীল সংঘাতকে উপহাস ক'রে দেখানো ছাড়া আর কিছু করা আপাততঃ সে-দেশে কোনো খাঁটি আর্টিষ্টের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমেরিকার আপামর জনসাধারণের জীবনপ্রণালীতেই যখন কোনো সৌষ্ঠব গড়ে উঠেনি তখন কথা-সাহিত্যকে সুন্দর ক'রে দেখাতে গেলে সে-সাহিত্য হোয়ে পড়ে মিথ্যে। সুতরাং, সত্যের জন্যে সিন্‌ক্লেয়ার্ লুইস্‌কে নিজের প্রতিভা খানিকটা ম্লান করতে হোয়েচে। তাই, তাঁর লেখাতে শুচিতার সংস্কার পাই না; পাই শুধু উপহাসের তীক্ষ্ণ উগ্রতা। ইয়াঙ্কি নর-নারীর এই আসল ও পরিপূর্ণ ব্যাবিটের রূপকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে ছাড়া বিচার করা চলে না, যদিও তা করা অনেকেরই পক্ষে খুব সহজ হবে ব'লে মনে হয় না।

শেইভিয়ান্ নক্‌সা

খবরের কাগজওয়ালারা অবিশ্যি বড়াই ক'রে বলে যে, ব্যর্ণার্ড শ' কেন, স্বয়ং ভগবানকে সম্ভব হ'লে তারা ইন্টারভিউ কোরতে পারে। কিন্তু এ-ও শুনেছি, শ' নাকি নিউস্‌পেইপার্ রিপোর্টারকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচে আসতে পারেন।

শ'র বই এককালে আমরা খুবই ঘাঁটা-ঘাঁটি কোরেচি: লরেন্স্, প্রুস্ত্ আর হাক্স্‌লীর পাল্লায় পড়ে আজকাল আমরা অনেকেই বোধ হয় শ'কে ভুলে যেতে আরম্ভ কোরেচি। তাই শ'র নাটকগুলো একবার রিভ্যাইস্ ক'রে দেখ্‌লে কেমন হয়?

তা হোলে আরম্ভ করি একেবারে গোড়া থেকে: সেই ১৮৯২ সালের লেখা *Widower's Houses.* যেখান থেকেই আরম্ভ করি না কেন, একেবারে *Too Good to be True* ও *Apple Cart* পর্য্যন্ত, শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্যি দেখা যাবে যে শ'র নতুনতম বই-ও পুরোনো মতেরই নতুন সংস্করণ। শ'র আর কিছু বদলালেও মতটা বেশি বদলায়নি।

মতটা কী? তাই না হয় নতুন ক'রে একটু আলোচনা করা যাক্। সত্যি বলতে কী, পুরোনো দিনের শ'ই যেন বেশি ভালো লাগে। তাই গোড়ার কথাই বলা যাক্।

ব্যর্ণার্ড শ' যখন প্রথম ইংলণ্ডে এলেন তখন তাঁর বয়স খুব বেশী নয়। এই সহায়-সম্বলশূন্য নাম-গোত্রহীন আইরিশ্

যুবককে লণ্ডনেব মতো জায়গায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা কোব্‌তে তখন কী প্রচণ্ড সংগ্রাম-ই না কব্‌তে হোয়েছিল !

কিছুদিনেব মধ্যেই শ' চট্ ক'রে একখানা উপন্যাস লিখে ফেল্‌লেন। সেইটেই তাঁর প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ; অনেক সাধ্য-সাধনা ক'বেও কিন্তু শ' কোনো প্রকাশককে বইটা ছাপাতে বাজি কবাতে পাবলেন না। ওদিকে কাব্‌ল্ মার্কস্-এব প্রচাবিত গণ-তন্ত্র ও সাম্যবাদেব মন্ত্র খুব জোব উৎসাহে গিল্‌তে আবম্ভ কব্‌লেন এবং আস্তে আস্তে ফেইবিযান্ সোসাইটিতে-ও ভিড়ে গেলেন।

ব্যর্ণার্ড শ'ব এই চট্ কোবে সাম্যবাদী হওযাব ভেতবে যে-পবিমাণে ছিল আকস্মিকতা, ঠিক সেই পবিমাণে ছিল যৌবন-সুলভ উগ্রতা। শ'ব পববর্ত্তী জীবনেব সাহিত্যিক জয-যাত্রাব ইতিহাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায যে, এই ঘটনাটীব যেটুকু মূল্য তা শুধু তাঁব যৌবন-প্রতিভাবই প্রচণ্ড বহিপ্র্রকাশেব মূল্য। নাট্য-সমালোচক হিসেবেই অবিশ্যি শ' পবে ইংল্যণ্ডেব সাহিত্য-সমাজে খ্যাতি লাভ ক'বলেন।

সমাজকে বিশৃঙ্খলতা ও অসমতাব থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবল আগ্রহে শ' তখন প্রবন্ধ লিখতে আবম্ভ ক'বলেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে আদর্শবাদ বা আইডিযালিজ্‌ম্ এবং ভাববিলাসিতা বা বোম্যাণ্টিসিজ্‌মেব মোহ চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'ব্‌তে লাগ্‌লেন। শ' বললেন : আদর্শবাদ জিনিষটা বাজনীতিশাস্ত্রে ভাবাবেগের কৃত্রিমধুব নামান্তব বই আব কিছু নয, এবং বোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্ হোচ্চে সেই সব লোকের ন্যাকামি যাদেব প্রহেলিকাচ্ছন্ন মন সহজভাবে কোনো জিনিষই দেখ্‌তে পারে না।

শ' তাঁর নিজের মস্তিষ্ক-সম্ভূত অনেক প্রকার নতুন-নতুন যুক্তি আবিষ্কার কোরে দেখালেন যে, পৃথিবীর নয়-দশমাংশ মানুষেরই দৃষ্টিশক্তি হয় অস্বাভাবিক, না হয় ক্ষীণ; এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও সবাইকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা কর্‌লেন যে একমাত্র তাঁরই নিজের দৃষ্টিশক্তি হোচ্চে স্বাভাবিক।

প্রতিভাবান যুবক শ'র এ-সব চোখা-চোখা বুলি ও সৃষ্টি-ছাড়া সমালোচনা ইংল্যণ্ডের লোকেরা খামখেয়ালী বোলে প্রথম-প্রথম উড়িয়ে দিতে চেষ্টা ক'র্‌লো; কিন্তু শ' নাছোড়-বান্দা হোয়ে, একরকম আদা-নুন খেয়েই তাদের পেছনে লেগে রইলেন; তাদের প্রবল ভাবে খোঁচাতে আরম্ভ করলেন। আঘাতটা হোয়েছিল গুরুতর: কেননা, শ' সব দিক্‌ দিয়ে সবাইকে যেরূপ অতিষ্ঠ কোরে তুল্‌লেন তার জন্য, তখন সে-দেশের লোক মোটেই প্রস্তুত ছিল না। শ' বুঝতে পারলেন যে এই হচ্ছে তাঁর সুবর্ণ সুযোগ: যে-অনুপাতে তিনি প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিকে ঘা দিতে পারবেন, তাঁর প্রতিপত্তি বাড়াবার, অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে দুর্নাম অর্জ্জন করবারও, সুবিধা সেই অনুপাতে বাড়্‌তে থাক্‌বে।

গোড়া থেকেই বোঝা গেল যে, শ'র মেজাজ-মর্জ্জির ভেতরে বাস্তবতার মাল-মস্‌লাই ছিল বেশি। তাঁর ভাবাবেগ-গুলি কখনো প্রবুদ্ধ মেধা ও বিচার শক্তির শাসন থেকে আল্‌গা পেতে পারেনি। তাই সুযোগটা দেখে, পরখ্‌ করবার জন্যে, তিনি ইব্‌সেনের নাট্য-প্রতিভাকে খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করতে লাগলেন; আর, সজোরে আঘাত করলেন ইংল্যণ্ডের বহু বহু বছরের পূজাপুষ্ট শেইক্‌স্‌পিয়্যর্‌-বিগ্রহকে।

তারপর, শ' আরম্ভ কর্‌লন নিজের মত প্রচার।

লোকমঞ্চেব ভাব-গতিক দেখে শ' স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে, যে-সব কথা তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কোরে ব'ল্‌চেন সেগুলি তারা অনেকেই সত্যি ব'লে গ্রহণ করচে। শ' রায় দিলেন: নাটক সম্বন্ধে আসল কথা হচ্ছে এই যে, তার কোনো বিশেষ বাণী আছে কিনা। তাঁর নিজের নাটক লেখাব উদ্দেশ্য হোলো: গোটা ইংরেজ জাতকে তাঁর নিজের মতের মতাবলম্বী করা। এবং এ-কথাও কবুল করলেন যে, তাঁর পণ হচ্চে পুবোণো, বস্তা-পচা, মব্‌চে-ধবা নৈতিকতাব কবল থেকে মানুষেব মন ও আত্মাকে তিনি বাঁচাবেন। জীবনের প্রারম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত ব্যর্ণার্ড শ'ব সে-পণ এক চুলও এদিক্ ওদিক্ নড়-চড় হয নি।

শ'র মনেব চেহাবা আব বদলালো না: সেই চিরদিনের ব্যর্ণার্ড শ'—ববাবব সেই একই কাজ কোবে যাচ্চেন। এবং সে কাজ হচ্চে মুখ্যভাবে ইংল্যণ্ডেব, এবং গৌণভাবে সমস্ত দুনিযাব, নর-নারীব মাথা থেকে পুবোণো, পোকায-কাটা, ব্যবহাব-জীর্ণ ভয-ভাবনা-চিন্তাগুলিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় কোরে, তাব জাযগায় নতুন নতুন সত্যগুলি ঢোকানো।

নিজেব মতামত ব্যাখ্যা কববাব জন্যে শ'কে নাটক লিখ্‌তে হোয়েচে অনেক: নাটক বিশ্লেষণ করাব জন্যে আবার তাদেব সঙ্গে জুড়ে দিতে হোযেচে বড়ো বড়ো ভূমিকা; আর সেই ভূমিকাগুলি সহজবোধ্য করাব জন্যে সময়ে-অসমযে, প্রযোজনে-অপ্রযোজনে কথা খবচ ক'র্‌তে হোযেচে প্রচুব। আর সে কী কথা! শ'ব লেখা নাটকের যে কোনো একটা ভূমিকা পডলেই মনে হবে যেন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রথম পাঠ পডচি।

শ' যদিও কথার অতুলনীয় যাদুকর, তবুও এ-কথা মনে কববার দরকার নেই যে, শুধু নাট্যকার হবার অদৃষ্টলিপি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর নিজস্ব যে-ক্ষমতাগুলি আত্ম-প্রয়োগের পথ তখন খুঁজ্ছিল সে-পথ তাঁর সেই সময়ে সহজে মিল্লো নাটক ও থিয়েটারের মধ্যে।

থিয়েটার না হোয়ে তখন যদি আর কোনো একটা কিছুর সন্ধান তিনি পেতেন, তা হোলে বোধ হয় সেটাকেই শ' তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাতেন। কেননা, তিনি খুঁজ্ছিলেন শুধু একটা পথ, একটা বাহন, সেটা যাই হোক্ না কেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে যাদের মনের ওপর তিনি প্রভাব বিস্তার ক'রলেন সেই তাদেরই মনের কাছে পরে আরম্ভ করলেন নিজের বাণী প্রচার কোরতেঃ থিয়েটারের সাহায্যে, তাঁর নাট্যের ভেতর দিয়ে।

ব্যর্ণার্ড শ'র কালাপাহাড়ীপণা প্রথম সুরু হোলো ভিক্টোরীয়ান্ যুগের প্রচলিত নাটক ও থিয়েটারের বিরুদ্ধে। সে-যুগের আদর্শ, রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা তিনি এক-এক করে নির্দ্দয় ভাবে ধ্বংস ক'রতে লাগলেন। এর ফল গোড়ায় খুব চমকপ্রদ হোলেও আসলে ছিল ঋণাত্মক; কিন্তু ধ্বংস করার এই আনন্দে শ' খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারলেন তাঁর স্বচ্ছ, নিঃশঙ্ক চিত্তের মৌলিকতা, আর টের পেলেন তার নতুন-ক'রে-গড়ে-তোলবার শক্তি।

শ'র ধ্বংসের খড়্গ প্রথমেই গিয়ে পড়লো ভিক্টোরীয় ধরণের নায়িকার ওপরঃ সেই কোমল, ভাবালু, আত্ম-প্রবঞ্চিত, সহজে-নেতিয়ে-পড়া নাটকীয় নারী-চরিত্রের উপর। আর তার পাশাপাশি এঁকে দেখালেন নব্যযুগের নতুন

ধরণের নায়িকা *Widower's Houses*-এ (বিপত্নীকের বাড়ী): 'ব্লাঁশ্ সার্টোরিয়াস্' চরিত্রে।

ব্লাঁশ্ই হোচ্চে সর্ব্বপ্রথম পুরোদস্তুর শেইভিয়ান্ নায়িকা: যার প্রকৃতিতে সেইসময়কার প্রচলিত নাটকীয় নারী-চরিত্রের মতো কোমলতা, নম্রতা বা কৃত্রিম সৌজন্যের বাড়াবাড়ি নেই, সে সরলা, কিন্তু অবলা নয়; এবং তার সেই সরলতার ভেতরে কাঠিন্যই বেশি, তার হৃদয়ে স্নেহের উত্তাপ এক রকম নেই বল্‌লেই হয়, সে হিসেবীপণাতেই পুরোমাত্রায় পটু। বাড়ীর চাকরাণীর চুলের মুঠি ধরা কিম্বা তাকে গলা-ধাক্কা দেওয়া, ও-সব তার কাছে নির্দ্দয়তা ব'লে মনেই হয় না; তা ছাড়া ও-সব তার মহিলাজনোচিত রুচিতেও বাধে না। মানুষের দৈন্য, দুঃখ ও কু-অভ্যাসগুলি সে ঘৃণার চোখে দেখে।

আবার, ব্লাঁশের বাবার চরিত্রে শ' দেখিয়েচেন একটা নির্দ্দয়, কাঠখোট্টা, মায়ামমতাহীন মানুষ, গরীবের রক্ত চুষে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পুরোমাত্রায় বজায় রাখতে তাকে একটুও বাধ্‌চে না। কিন্তু এ-মানুষটীর মেয়ে ব্লাঁশ্ আবার তার বাবার চেয়েও এক কাঠি বাড়া। এক জায়গায় গরীবদের লক্ষ্য ক'রে ব্লাঁশ্ বল্‌চে—"উঃ, ঐ ব্যাটাদের দেখ্‌লেই আমার গা জ্বালা করে! ঐ সব নোংরা, মাতাল, নির্লজ্জ লোকগুলো পশুর মতো থাকে, ওদের দেখলেই আমার ঘেন্না বেড়ে যায়!"

ভিক্‌টোরীয় যুগের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের পক্ষে গরীবদের সম্বন্ধে মনে-মনে এরূপ ভাব পোষণ করা সম্ভবপর হোলেও, ওরূপ তীব্র, ঘৃণাত্মক ভাষায় তা প্রকাশ করা

কোনো প্রকারেই সম্ভব ছিল না। শ' দেখাতে চাইলেন যে, তথাকথিত ভদ্রমহিলাদের পক্ষে ওটাই হোচ্ছে ভিক্টোরীযান্ যুগের ন্যাকামি, আত্মপ্রবঞ্চনা ও অসরলতা। প্রতিদিন-কাব জীবনে ও রঙ্গমঞ্চের এই কপটতা ও কৃত্রিমতার অনাবৃত চিত্র সবাইর চোখেব সামনে তাই তিনি খুলে ধবলেন।

আধুনিক নরনারীব ভালোবাসা, বিশেষ ক'বে তাদের প্রাগ্‌বৈবাহিক প্রেমবিনিময, কী বকম ভাবে হওয়া স্বাভাবিক সে সম্বন্ধেও শ'র নিজেব বক্তব্য তাঁর এই নব্যনাবী ব্ল্যাঁশ্-চরিত্রে পাওযা যায। বলিষ্ঠ প্রকৃতিব প্রেমিকের অবিবাম প্রেমগুঞ্জন-স্তব শুনতে শুনতে নীবব লজ্জায ব্ল্যাঁশেব মুখ বাঙা হোয়ে ওঠে না, কেননা, প্রেমাস্পদেব পূজা-নিবেদনেব সাম্নে সে চুপ ক'বে বসে নেই, ববঞ্চ, প্রেমেব প্রতিনিবেদন কোবতে সে-ই বেশি তৎপর ও পটু। প্রেমেব এই অবস্থাটাই শ'ব কাছে খুব স্বাভাবিক ও সঙ্গত মনে হোলো।

মানুষ প্রেমকে কৃত্রিম ভদ্রতা ও ভাবালুতার মিথ্যা বাড়াবাড়ি দিযে যতই ঢাকতে চেষ্টা করুক্ না কেন, শ' বল্‌লেন : এই হোচ্ছে প্রেম-শাস্ত্রেব খোলাখুলি বহস্য। প্রেম-সম্বন্ধীয এই নতুন মত প্রচারেব ফলে দাঁড়ালো এই : *Widower's Houses* লিখে শ' নাট্যকার হিসেবে লোকের কাছে যথেষ্ট অপযশভাজন হোলেন, এবং এ-কথা পবে তিনি নিজেব মুখেই স্বীকার কোরেচেন।

এর এক বছর পরে, ১৮৯৩ সালে, শ' *The Philanderer* (উচ্ছৃঙ্খল প্রেমিক) এবং *Mrs. Warren's Profession* (মিসেস্ ওযারেনের ব্যবসা) এই দু'খানা নাটক লিখলেন।

প্রথম নাটকে শ'র নব-নারীর ছবি আরো উগ্র হোয়ে ফুটে উঠ্‌লো; অর্থাৎ হ্বিক্‌টোরীয়ান্ যুগের সেই সলজ্জ বিহ্বলতা, এক কথায় শ' যে-জিনিষকে বোলেচেন নির্ব্বুদ্ধিতা, তার বদলে তাঁর নারীচিত্রে দেখা গেলো শুধু একটা বুদ্ধিগত স্বাতন্ত্র্য ও ধরা-ছোঁয়া-যায়-না এমন একটা ব্যবহারিক বাস্তবতা। তাই, *The Philanderer*-এ সিল্‌হ্বিয়া-চরিত্রে ফুটে উঠেচে শুধু একটা উন্নাসিক উদাসীনতা ও দুর্নিবার পুরুষ-বিদ্বেষ। সিল্‌হ্বিয়ার এই দোষগুলি খুবই বিশ্রী ও বিসদৃশ হোয়ে পড়তো যদি না সেগুলোকে শ' হাস্যাস্পদ ক'রে দেখাতেন।

Mrs. Warren's Profession-এ শ'র নব-নারীর নাটকীয় রূপ যে আরো কত বেশি উগ্র হোয়ে পরিস্ফুট তা হ্বিহ্বি ও তার মা'র চরিত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। হ্বিহ্বি অঙ্কশাস্ত্রের একজন বিচক্ষণ পণ্ডিতানী, তার জীবন-যাপনের সব কিছুরই ওপর একটা নিজস্ব বিশেষত্বের ছাপ পড়েচে। কিন্তু তার মা'র ব্যবসা হোলো: পয়সাওয়ালা, উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী লোকদের জন্যে মেয়েমানুষ যোগাড় ক'রে দেওয়া; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তার নিজের মেয়ে হ্বিহ্বি'র অত্যধিক স্বাধীন ও বেআব্রু ভাব মিসেস্ ওয়ারেন্ কিন্তু নিজে মোটেই সহ্য ক'রতে পারচে না; এবং মনে-মনে তা এতটা অপছন্দ ক'র্‌চে যে হ্বিহ্বি'র চাল-চলন যে মেয়েমানুষের পক্ষে খুবই অশোভন সেরূপ মন্তব্য-ও প্রকাশ ক'রতে দ্বিধা বোধ ক'র্‌চে না: এ-অবস্থায় মা-মেয়ের ভেতরে সঙ্ঘাত হওয়া অনিবার্য্য।

হ্বিহ্বি, অবিশ্যি, মনে করতে পারতো: হাজার হোক্

মা তো; এবং প্রচলিত মাতৃসংস্কারের প্রভাবে তার মা'কে হয়তো সে ক্ষমার চোখেও দেখতে পারতো; কিন্তু সে তার মা'র অদ্ভুত আচরণ তন্নতন্ন ক'রে খুঁটে খুঁটে বিচার ক'রে দেখতে লাগলো: শুক্‌নো নীতিবাগীশের চোখ দিয়ে নয়, সাধারণ সাংসারিক চোখ দিয়ে। যে-আচরণের ভেতরে নোংরামি ও লুকোচুরী র'য়েচে সে-আচরণকে বরদাস্ত করা ভিভি'র পক্ষে মোটেই সম্ভব হোলো না। সে দেখতে পেলো যে তার নিজের চিন্তাধারা একেবারে বিপরীত ধরণের; তার সঙ্গে তার মার কার্য্যকলাপের কোনোই মিল নেই। কাজেই ভিভি ভাব-বিলাসিতাকে সংযত ক'রে রাখলো তার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির লাগাম পরিয়ে।

এই নাটকখানা শ'র পরিহাস-বিদ্যার চূড়ান্ত নিদর্শন। এ থেকে আর একটা জিনিষও খুব স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় যে, শ'র কালাপাহাড়ীপণা শুধু তখনকারদিনের অভ্যস্ত নৈতিকতার বিরুদ্ধেই আক্রমণ নয়: নৈতিকতা অতিক্রম ক'রে-ও তার গতি অনেক দূর পৌঁছেচে: সে আক্রমণ একেবারে গোটা নর-নারীর যৌন-সমস্যার গায়ে গিয়ে লেগেচে।

মোটামুটি বোল্‌তে গেলে, শ' প্রতিপন্ন ক'রতে চেয়েছেন: মানব-সভ্যতার প্রথম যুগে যৌন ব্যাপারটা ছিল একটা স্বতঃ-উৎসারিত মানসিক উত্তেজনা মাত্র; কিন্তু মানব-সমাজের ক্রম-বিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে যৌন-প্রবৃত্তির চেহারা অনেক বদলে গেচে; নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্ক ও সন্তান-সৃষ্টিঘটিত ব্যাপারগুলি ভিক্‌টোরীয়ান্ যুগের মানুষ কেবলই একটা রোম্যান্সের আবরণ দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা কোরচে; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে

প্রেম ও যৌন-প্রবৃত্তির মূলগত সমস্যাগুলি নাড়াচাড়া ক'রে না দেখা, শ'র মতে, নিতান্তই মূর্খামি। সুতরাং, শ' রোম্যান্সের প্রহেলিকা ভেদ ক'রে, 'কোর্টশিপ'-কে বিবসনা ক'রে দেখালেন যে ও-ব্যাপারটি যৌন-সংগ্রামের রকমফের মাত্র।

শ' আরো বল্‌লেন: যৌনযুদ্ধে প্রলোভনের অস্ত্র নিয়ে নারী বেরিয়েচে শিকার ধরতে; এবং পুরুষ-শিকারটি আট্‌কা পড়ে গিয়ে বেরুবার পথ পাচ্ছে না। যৌন-সম্পর্ককে ফুলিয়ে, কাব্যের ভাবাবেগ দিয়ে বহুকাল ধ'রে যারা ওটাকে খুব বড় ক'রে এসেচে, তাদের মনকে শ'র ঐ যৌন-সম্পর্কের নগ্ন চিত্র কী প্রচণ্ডভাবে আঘাত ক'রেছিল, আজকের দিনে তা বোধ হয় কেউ কল্পনাও ক'রতে পারে না।

নারীর এই শিকারিণী-ব্যাধিনী-রূপ দানা বেঁধেচে শ'র ১৯০১ সনে লেখা *You Never Can Tell* (কিছুই বলা যায় না) নাটকে। এবং তা আরো সুস্পষ্ট আকার পেয়েচে ১৯০৩-এ রচিত *Man and Superman*-এ (মানুষ ও অতিমানুষ)। *Man and Superman* এর প্রতিপাদ্য বিষয় হোচ্চে: বংশানুক্রমিক ধারা চিরন্তন ও অশেষ কোরে রাখবার জন্য নারী কেবলই পুরুষের পিছু-পিছু শর-সন্ধান কোরে চলেচে এবং তাকে পাক্‌ড়াও কোরে তার নিজের সন্তানের পিতা কোর্‌চে। শ' বোলচেন: এটাই হোচ্চে 'লাইফ্‌ ফোর্স্‌'; নারী-ধর্ম্ম ও পুরুষ-স্বভাবের অনিবার্য্য নিয়ম ও পরিণতি। শ'র এই পরিকল্পনা যে একেবারে আন্‌কোরা নতুন ও মৌলিক তা নয়; অনেক বছর আগে শোওপেন্‌-হাওয়ার্‌ তাঁর *Metaphysics of Love* বইতে বংশরক্ষার

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ব'লে যা ব্যাখ্যা ক'রেচেন, শ'র 'লাইফ্ ফোর্স' মূলতঃ ও বস্তুতঃ সে একই জিনিষ।

Man and Superman-এ শ' এই পরিকল্পনাটি ফুটিয়ে তুলেচেন একটা সহজ, হাস্য-কৌতুকপূর্ণ ব্যঙ্গ-চিত্রের ভেতর দিয়ে। পুরুষ 'জন্ ট্যানার্'কে ধরবার জন্য ক্রমাগত ছুটে আস্‌চে তার পেছনে-পেছনে ব্যাধিনী-নারী 'অ্যান্'; এবং এই ব্যাধিনীর কাছেই অবশেষে ট্যানার্ কোর্‌লো আত্মসমর্পণ। দুই কারণে : এক আত্মরক্ষার জন্যে, আর এক দাসত্বের কলঙ্ক থেকে নিজেকে বাঁচাতে। ট্যানারের সাধ্যও ছিল না অ্যানের হাত থেকে এড়ানো; আবার অ্যানের কাছ থেকে ছাড়া পাবার-ও উপায় ছিল না তার। কেননা, অ্যান্ই হোচ্চে তার 'লাইফ্ ফোর্স্' : যে-শক্তি তার দুর্দ্দমনীয় প্রবাহে ট্যানার্‌কে এমনি ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, যে তাকে প্রতিরোধ করা দূরে থাকুক্, তার কাছে থেকে দূরে স'রে থাকারও তার উপায় ছিল না।

জন্ ট্যানারের আর একটা রূপ-ও আমরা শ'র এই নাটকে দেখ্‌তে পাই : সেটা হোচ্চে আধ-পৌরাণিক, আধ-ঔপন্যাসিক, দাম্ভিক, উচ্ছৃঙ্খল, প্রেমিক বীর ডন্ হুয়ানের আধুনিক মূর্ত্তি। এখানেও শ'র কালাপাহাড়ীপণার আর একটা নমুনা র'য়েচে। ঔদ্ধত্যের জোরে নিজের খুসিমতো মেয়েমানুষ ধ'রে বেড়ানো এবং তার সঙ্গে নিজের মর্জ্জিমতো প্রেমের খেলা করা ঐটেকেই এতদিন লোকে ডন্ হুয়ানের রোম্যান্টিক্ মূর্ত্তি ব'লে জেনে এসেচে; কিন্তু সে-মূর্ত্তিকে শ' দিলেন এক আঘাতে ভেঙ্গে। আধুনিক ডন্ হুয়ান্, অর্থাৎ, জন্ ট্যানার্-এর ভেতরে যে ঔদ্ধত্য একেবারেই

নেই তা নয, কিন্তু সে-ঔদ্ধত্য অ্যানের ক্যাবামতিব কাছে একেবাবেই জোলো। শ'ব মতে, এ-যুগেব প্রেমিক বীরের মেযেমানুষ পাকড়াও কবাব ভেতবে বিশেষ কিছুই বাহাদুবী নেই ; তাব বিশেষত্ব হোচ্চে মেযেমানুষের কাছে ধবা পডায়।

নাবী যে কেবল প্রকৃতিরূপিণী মহাশক্তিব চব ও যৌন প্ররোচনায সদা-সচেষ্ট উদ্যোগত্রী, এ তত্ত্ব শ' আবো বেশি প্রাঞ্জল ক'বে দেখিযেচেন তাব ১৯১০-সালে লেখা *Misalliance* (গড়মিল) নাটকে। নির্দ্দয শিকাবীব মতো প্যব্সিহ্যালের পেছনে-পেছনে ছুটলো হাইপেইশিযা, এবং এই 'লাইফ্ ফোর্সে'ব পশ্চাদ্ধাবনেব কাছে হাব মেনে অবশেষে হাঁপ ছেডে তবে সে বক্ষা পেলো। শ'ব এ-সব আবিষ্কাব ও তাব বিশদ বিশ্লেষণ ইংরেজি সাহিত্যে শুধু নতুন নয, একেবারে নিদারুণ নতুন, ভ্রিক্টোবীযান্-যুগ-শাসিত ইংল্যণ্ডেব পক্ষে এই নিদাকণ নতুনত্ব গলাধঃকবণ কবাটা যে কী মাবাত্মক ব্যাপাব হোযে উঠেছিল তা আজ আমাদেব ধারণাতীত।

নাবীব নাবীত্ব সম্বন্ধে শ' যে-সত্য দাঁড কবিয়েচেন স্ত্রীব স্ত্রীত্ব সম্বন্ধেও তদ্রূপ। *Candida* নাটকেব নাযিকা ক্যান্ডিডা-ই হোচ্চে পুবোদস্তুব শ'-পবিকল্পিত স্বাধীনতা-প্রাপ্ত স্ত্রীর পবিপূর্ণ প্রতিকৃতি। ভ্রিক্টোরীয়ান্ নাযিকাদেব মতো ক্যান্ডিডা কোমলস্বভাবা, সলজ্জা, আজ্ঞাকাবিণী স্ত্রীটি নয, সে ঘরে-বাইরে পুরোমাত্রায আলোক-প্রাপ্তা, আধুনিক স্ত্রী।

ভ্রিক্টোবীয়ান্ যুগের নাটকীয-নাযিকা-চূর্ণের সঙ্গে-সঙ্গে শ' আরো একটা বিগ্রহ ভাঙ্তে আবম্ভ ক'বেছিলেন : সে হোচ্চে রঙ্গমঞ্চে বড় যোদ্ধাদেব বীরত্বকে ঠুন্কো শৌর্য্য-

বীর্য্যেব বাষ্প দিযে স্ফীত ক'রে তোলবার রীতি। ইংল্যণ্ডে, ব'লতে গেলে ব্যর্ণার্ড শ'ই সর্ব্বপ্রথম প্রতিপন্ন কোরতে চেয়েচেন যে, আধুনিক যুদ্ধে, সাজ-গোজ প'রে যোদ্ধাদের বীবত্বেব কস্‌রত করার অবসর বড একটা হয় না, আজকাল যুদ্ধ জিনিষটা নেহাৎই গদ্যময়, ব্যবহারিক ব্যাপাব; তাতে মস্তিষ্কেব কস্‌রতই দবকাব হয বেশি, বুদ্ধিব বিচক্ষণতা ও আযোজন-অনুষ্ঠানেব কৌশল ছাড়া আধুনিক যুদ্ধ চলে না। *Arms and the Man* (অস্ত্র ও পুরুষ) নাটকে শ' ক্যাপ্‌ট্যান্ ব্লুন্‌ট্‌শ্‌লি-চবিত্রে সেই আধুনিক বকমেব যোদ্ধাকে হুবহু এঁকে দেখিযেচেন: যার যুদ্ধ করাই ব্যবসা, যাব মধ্যে বীবত্বের বাহাদুবী নেই, অর্থহীন আস্ফালন বা লাফালাফি নেই, যাব ভেতর ভাবাবেগ প্রশ্রয দেবারও প্রবৃত্তি নেই।

The Man of Destiny-নাটকে নেপোলিয্যনেব বোমান্টিক্ খোসা ছাড়িযে দিয়ে রক্ত-মাংসের আসল মানুষটাকেই বার ক'বে দেখিয়েচেন। শ' বোঝাতে চেযেছেন এই: নেপোলিয্যন্ বিশ্ববিশ্রুত যোদ্ধা হোয়েছিলেন সেটা তাব নিজের বিশেষ কোনো বণ-কৌশল বা অতিমানুষিক প্রতিভার জোবে নয়, নিতান্তই গ্রহবৈগুণ্যে ও ঘটনাচক্রে। সুতরাং, নেপোলিয্যন্‌কে নিযে এত বাড়াবাড়ি, লাফালাফি কবাব কী হোযেচে? অন্যান্য ঐতিহাসিক নর-নারী নিযেও শ' ঐ একই কাণ্ড কবেচেন; কেননা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নব-নারী গুলিকে এতকাল অযথা, অসম্ভবরূপে স্ফীত করা হোয়েচে। *Cæsar and Cleopatra*-তে শ' সীজাব্ এবং ক্লিওপাট্রাকে সাধাবণ মানুষের মতো কবেই এঁকেচেন: আমাদেরই মতো

আজকালকার অতিসাধারণ ভাষায় তাদের কথাবার্তা বলিয়েছেন। ইতিহাসকে অসাধারণত্বের মিথ্যা থেকে উদ্ধার করাই ছিল শ'র উদ্দেশ্য।

এই তো গেল শ'র কয়েকখানা বিশিষ্ট নাটকের আখ্যান বস্তু ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের কথা। এখন দেখা যাক্, নাট্য-রচনা প্রণালীতে শ'র ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য কোথায়। শ' নাট্যের প্রচলিত কোনো রীতিনীতিই মানেন নি : একেবারে নতুন নিয়মে, সম্পূর্ণ নতুন ধরণে তাঁর প্রত্যেকটা নাটক তিনি সৃষ্টি করেছেন। কোনো অভ্যস্ত বাঁধাধরা নিয়মে নাটক লিখ্‌তে হবে এ কথা শ' গোড়া থেকেই স্পষ্ট ভাবে অস্বীকার কোরেছেন, তাই কোনো বিশেষ ঘটনা বা চরিত্রের ওপর জোর না দিয়ে তাঁর নাটকগুলি তিনি গাঁথতে চেয়েছেন। আইডিয়াগুলির সঙ্গে আবার জড়িয়ে আছে তাঁর কোনো না কোনো বিশেষ চিন্তাসূত্র। এর ফল হোয়েছে এই যে, শ'র সমস্ত নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগুলিই হোয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর নিজের চিন্তা-ভাবনার বাহন : তারা যেন শ'র নিজের হাত-গড়া, মন-গড়া পুতুল : তাদের নিয়ে শ' তাঁর নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের খুসিমতো খেলা কোরছেন।

শ'র নাটকের নায়ক-নায়িকাদের কথোপকথন শুন্‌লে মনে হয়, সেগুলি যেন শ'র সখের পোষাকি কথাবার্তা দিয়ে তৈরি টেনিস্ বল্ : রঙ্গমঞ্চরূপ জালের ওপর দিয়ে, এর মুখ থেকে ওর মুখে, সেগুলি কেবলই প্রতিহত হোয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের কারুরই যেন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, তাদের সৃষ্টি-কর্ত্তার আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তারা যেন লেজুড়ের মতো ঝুলে আছে। তার কারণ, শ'র কাছে অভিনয়ের আসল অর্থ

হোচ্ছে : তার ভেতরে বিশেষ কোনো বাণী পাওয়া যায় কিনা। সাধারণতঃ, হালকা ও লঘুরসের ভেতর দিয়েই শ' তার বাণী শ্রোতার কাছে গ্রহণীয় করবার চেষ্টা কোরেচেন।

যে-সব কথা তিনি ঠাট্টা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে বোলেচেন লোকে সেগুলিই অকপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই বরাবর গ্রহণ ক'রেচে। আর যে মুহূর্ত্ত থেকে থিয়েটার একবার শ'র করতলগত হোলো, অমনি সেটাকে কাজে লাগিয়ে দিলেন তাঁর নিজের কথা বলবার জন্যে, এবং তারপর সেটাকে ছেড়ে দিলেন, তাঁরই নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার বিশদ সমালোচনা করবার উদ্দেশ্যে, তর্ক-বিতর্কের হাটে। সুতরাং, এ-কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, তর্ক-বিতর্ক করবার প্রচুর উপাদানই শ'-র নাটকের ভেতরে আছে। চট্‌পট্, ধারালো, জোরালো কথা গাঁথতে শ' এতো ভালো পারেন ও এতো বেশি জানেন যে, তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীরা বুদ্ধিগত প্রখরতা ও বাক্‌চাতুর্য্যে যে খুব পটু হবে তাতে আর আশ্চর্য্যের কী আছে?

মুখ্যতঃ, শ'র নাটকগুলি যে আলোচনামূলক সে-কথা খুবই সত্যি; অবিশ্যি শ' স্বীকার ক'রেচেন যে আলোচনামূলক ছাড়াও নাটক হোতে পারে। কিন্তু সে-রকম নাটক তিনি লিখতে পারবেন না, জানেন-ও না; কেননা, তিনি একাধারে নাট্যকার ও নীতিবাগীশ। তাই, শ' বলেচেন: হয়তো এখন পর্য্যন্ত তাঁর নাটক বুঝবার মতো ক্ষমতা বেশির ভাগ লোকের হয় নি, কিন্তু মানুষ যখন আরো পরিণতবুদ্ধি ও পরিমার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন হোয়ে উঠবে তখন তাঁর নাটকের তাৎপর্য্য বোঝা তাদের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না।

শ'র দাম্ভিকতা অসীম; কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাঁর নাটকের আসল অর্থ না-বুঝতে পারার ক্ষমতারও সীমা নেই।

লেখার আইডিয়া ও মালমশ্‌লা নিয়ে খেলতে যে-আনন্দ, বড়-বড় কথাশিল্পীদের মতো ব্যর্ণার্ড শ'-ও তা পুরোমাত্রাই উপভোগ কোরে থাকেন। তাঁর হাস্যরসবোধ যথেষ্টরূপে সচেতন ব'লেই তিনি দুরূহতম তথ্যকে হাস্য-কৌতুক দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন। অবিশ্যি প্রতিদানে আমাদের কাছ থেকে আশা করেন: আমরা যেন সেটাকে শুধু হাসির ব্যাপার ব'লেই হেসে উড়িয়ে না দিই।

শ্রোতারা হাসলো কী গম্ভীর হোয়ে বসে রইলো সেটা শ'র কাছে নিতান্তই গৌণ, আর তারা যদি হাসে-ও তাতেও তাঁর কিছুই এসে যায় না। কেননা, শ' বলেছেন, যে কোনো ভাঁড় বা নিরেট মূর্খ-ও লোক হাসাতে পারে। শ' দর্শকের কাছে হাসির চেয়েও আরো বেশি কিছু প্রত্যাশা করেন: তিনি চান যে আমরা হাসির আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর চিন্তাধারার মর্ম্ম স্থানে যেন পৌঁছুতে পারি।

অধিকাংশ সময়ে শ্রোতারা তা পারেনি ব'লে, অর্থাৎ হাসির উপরিতল অতিক্রম তার অন্তস্তল অবধি নামতে পারেনি ব'লে, শ' বার-বার তাদের উপহাস ক'রেছেন। লোকে তাঁর মতামত সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ ক'রবে এ বিশ্বাস তাঁর চিরদিনই ছিল, তা না হোলে তিনি আলোচনামূলক নাটক লিখতেন-ই না; এবং তার সঙ্গে জুড়ে-ও দিতেন না দীর্ঘ-দীর্ঘ ভূমিকা। হাস্য-পরিহাসের ভেতর দিয়ে মানুষের মনোভাব বদ্‌লাবার ব্যবস্থা করাই হোচ্ছে শ'র কমিক্ আর্টের বিশেষত্ব।

একজন সমালোচক শ'ব আর্টকে বলেচেন : "a mixed delivery of goods" ; অর্থাৎ তাতে হাস্য-কৌতুক ও তত্ত্ব-কথা দুই-ই আছে। শ'র মতে, কমেডিব আসল উদ্দেশ্য হোচ্চে : পুরোনো ও সংস্কার-জীর্ণ সামাজিক এবং নৈতিক অভ্যাসগুলিকে হাস্যাস্পদ ক'বে দেখানো। বের্গ্‌সঁ যে-জিনিষটাকে "a kind of social ragging," অর্থাৎ ক্ষেপিয়ে, খুঁচিযে সমাজকে উদ্‌ব্যস্ত ক'রে দেওযা বলেচেন : তার সঙ্গে শ'ব এই ব্যাখ্যার অনেক সাদৃশ্য আছে। বের্গ্‌সঁ আবো বলেচেন যে, সমষ্টিগত নির্ব্বুদ্ধিতা ও অন্ধতাকে লজ্জিত ক'বতে হোলে হাস্যবসেব মতো ওষুধ আর নেই।

তাই, সেই অর্থে, ব্যর্ণার্ড শ'ব হাসি শুধু হাসিব ছলনা নয় : হাসিব পীডন। এ জন্যই সে-হাসি এতো তীব্র, ঝাঁঝালো ও ছুঁচোলো, কিন্তু তাব মধ্যে কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই, তাতে আছে কেবল তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি।

শ'র নাটক বহুদিন ধ'বে একটানা ভাবে মানুষেব মন অধিকাব ক'রে এসেচে এবং সমান আগ্রহে মানুষ তাঁব নাটক দেখ্‌বাব জন্যে ভিড জমিযে এসেচে। বোধ করি আব কোনো যুগে, কোনো দেশে, কোনো নাট্যকাব এতো দীর্ঘ দিন ধ'রে লোকের কাছে এমন অচপল প্রশংসা ও অনুবাগ পায নি।

ব্যর্ণাড শ'র নাটক পাশ্চাত্য জগতেব লোকেব চিত্তসমুদ্র তোলপাড ক'বে দিযেচে, তাদের চিন্তা-ভাবনা, বহির্দৃষ্টি, অভিরুচি, অভিমত সব কিছুরই একটা প্রচণ্ড ওলট-পালট ক'বে দিয়েচে ; আর তাবাও নিজেদের বোকামি ও গোঁডামি বুঝতে পেবে হেসেচেও প্রচুব।
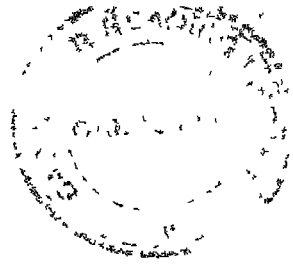
যত যুগ যায়

ইংল্যাণ্ড মাত্র দুটো যুগকেই নাটকের আসল যুগ বলা যেতে পারে : এলীজাবীথন্ ও পঞ্চম-জর্জ্জ্যান্। অবিশ্যি, এলীজাবীথন্ যুগের নাটকের ধরণ-ধারণ থেকে আজকালকার ইংরেজী নাটকের ধরণ-ধারণ অনেক আলাদা, কিন্তু আর সব রস-শিল্পীকে একেবারে ম্রিয়মান কোরতে পেরেছিল এলীজাবীথন্ যুগের নাট্য-শিল্পীরাই ; আর পেরেছে এ-যুগের নাট্যকার।

সেইক্‌স্‌পীয়্যর্ ও বেন্ জন্‌সনের পরে সত্যিকারের উপভোগ্য ও উঁচুদরের নাটক ইংলণ্ডে তিন শ' বছরের ভেতর কেউ লিখ্‌তে পারেনি, বোধ হয় লিখ্‌তে চেষ্টাও করেনি।

নাট্য-কলার ভেতর দিয়ে মানুষের রসানুভূতির পরিপূর্ণতা-সাধন হোতে পারে সে-কথা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত যত কবি ও সাহিত্য-শিল্পীর আবির্ভাব হোয়েচে তাদের কারুরই সাহিত্য-সৃষ্টির ভেতরে বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সেরিডন্ থেকে টমাস্ রবার্টসন্ অবধি ব্রিটিশ্ নাট্য-দেবী অর্দ্ধ সুষুপ্তি-মগ্না হোয়েই ছিলেন। শেলি, বায়রন্, ব্রাউনিং ও টেনিসন্ অবসরমতো নাটক-রচনায় হাত দিয়েছেন, সে কথা সত্যি, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে হোয়েচে ইংরেজী গদ্য-সাহিত্যের বিশাল আড়ম্বর, আর যখন উনবিংশ শতাব্দী আরম্ভ হোলো তখন চললো পদ্য-রচনার উদ্দাম লীলা ; আর তার সঙ্গে-সঙ্গে উপন্যাস-সাহিত্যের বিস্তৃতি : নাটক রইলো পেছনে পড়ে।

পিনরো, হেনরী আর্থার জোন্‌স্‌, ব্যারী ও বার্ণার্ড্‌ শ' পঞ্চম জর্জ্জ সিংহাসনে বসবার আগেই নাটকে কিছু কিছু নতুন জিনিসের অবতারণা করেছিলেন। ১৮৯০ সালের পর থেকেই কবিতা ও উপন্যাসের গতি মন্থর হোতে লাগলো। এই চার জন নাট্যকার এসে দাঁড়ালেন ইংরেজী সাহিত্যের গতি-পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে: পিনরো যখন লিখলেন তাঁর প্রহসন, *The Squire*; আর জোন্‌স্‌ লিখলেন তাঁর মেলোড্রামা, *Saints and Sinners*, তখন সন্ধিক্ষণ প্রায় উত্তীর্ণ। ভিক্‌টোরীয়ান্‌ ন্যাকামিতে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো যখন পিনরোর *The Second Mrs. Tanqueary* বেরুলো। এলেন তখন বার্ণার্ড শ'; খসে পড়ল ভিক্‌টোরীয়ান্‌ যুগের কপটতা; এবং সেই কপটতার আবরণে-ঢাকা সাহিত্যের সব নকল রূপ।

তিন শ' বছর পরে ইংলণ্ডে নাটক আবার ফিরে পেলো বাস্তব জীবন চিত্রিত করবার অধিকার; এবং সে-চিত্রের ভেতর দিয়ে লোককে আনন্দ দেবার, শিক্ষা দেবার, হাসাবার, যতটা না কাঁদাবার, ক্ষমতা।

সেইক্‌স্‌পীয়্যর্‌ ও বার্ণার্ড শ': এ দুজনের মাঝখানে কত বড় একটা ফাঁক: শতাব্দীর ফাঁক, চিন্তাধারা, রস-ধারার ফাঁক: ফাঁকটা পড়লো চোখে যবে থেকে জর্জ্জ্যান্‌ যুগের সূত্রপাত। এক দিকে শ' লাগলেন সব কিছু ভাঙ্‌তে: কথায় তাঁর কেবলি ব্যঙ্গ: ভাষায় তাঁর শুধুই কষাঘাত: আদর্শবাদ, ভাবোচ্ছ্বাস কোথায় গেলো ভেসে! এলো মহাসমর, হোয়ে গেলো একটা প্রচণ্ড ওলট-পালট। এ যুগে কী আর ট্রাজেডী লেখা হোতে পারে? কেবলি কমেডি

আর সঙ্গে সঙ্গে এমন সব নাটক যাতে আছে নিছক প্রপাগ্যাণ্ডা। কমেডি-নাট্য আর প্রপাগ্যাণ্ডা-নাট্য-ই বর্ত্তমান যুগের আনকোরা নিজস্ব জিনিষ: এ দুটোতেই তার বিশেষত্ব।

এখন-ও শ'র প্রবর্ত্তিত ধারা ও তার রকমফেরই জর্জ্জ্যান্ নাট্যে চল্‌ছে: ব্যারি, গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি, অস্‌কার ওয়াইল্‌ড্ থেকে আরম্ভ ক'রে আরনল্ড্ বেনেট্, অ্যাল্‌ফ্রেড্ সাত্রো, ড্রিঙ্ক্‌ওয়াটার্, বার্কলি, মান্‌রো, অ্যাশ্‌লি ডিউক্‌স্, ক্লোব্‌নক্, সমারসেট্ মহ্‌ম্, ক্লেমেন্স্ ডেইন্, ঈড্‌ন্ ফিল্‌পট্‌স্, সাট্‌ন্ হ্বেইন্, মিল্‌ন্, শ্যন্ ও'কেইসি, লনস্‌-ডেইল্, নোয়েল্ কাওযার্ড, ঈউজীন্ ও'নীল্ পর্য্যন্ত সবাই মোটামুটি ঐ একই ছাঁচে গড়েচে ইংরেজী নাটক।

জর্জ্জ্যান্ যুগে ইংলণ্ডের নাটক তার ভৌগোলিক গণ্ডী অতিক্রম ক'রেচে, তাই, প্যারিসের থিয়েটারে আজ ইংরেজী নাটকের আদর। জ্যর্ম্মনি যেমন ক'রে একদিন সেইক্‌স্‌-পীয়র্‌কে গ্রহণ ক'রেছিল আজ ঠিক তেমনি করে আপনার ক'রে নিয়েছে শ'কে। মহ্‌ম্ ও কাওয়ার্ডের নাটক অভিনীত হোয়েছিল নিউ ইয়র্কের থিয়েটারেই প্রথম: ইংলণ্ডের লোক দেখেচে পরে।

জর্জ্জ্যান্ যুগের নাটক মোটামুটি কোনো কারণ নিয়ে মাথা ঘামায় নি: শুধু যুগ-সমস্যাগুলির বাহ্যিক রূপ ও তাদের ফলাফল নিয়েই নাড়াচাড়া কোরেচে। ইব্‌সনের নোরা-কে ঘর ছাড়িয়ে টেনে বাইরে এনেছিল 'ইম্যান্‌সিপেইসনের' অনাস্বাদিত আনন্দ: লন্‌স্‌ডেইল্ ও কাওয়া-র্ডের নাটকের মুক্তিলোভী মেয়েরা দেখ্‌চে যে, বাইরের

জগতটা ঘরের জগতের চেয়ে এমন কিছু বেশি লোভনীয় নয়।

অতি-আধুনিক মেয়েগুলো নিয়ে হোয়েচে তাই জর্জ্জ্যান্ নাট্যকারেব বিষম বিপর্য্যয়ঃ তাবা ঘরও চায় না, বাইরে এসেও হাঁসফাঁস ক'রতে থাকে। এই যে লক্ষ্যহীন, অকারণ চঞ্চলতা—বিশেষ করে মেয়েদেব মধ্যে—তাই মূর্ত্ত হোয়েচে জর্জ্জ্যান্ নাট্যে। সে-নাট্যে নারীব হঠাৎ-পাওয়া স্বাধীনতা ও হঠাৎ-বিলিয়ে-দেওয়া প্রেমের কোনো সমাধান নেইঃ আছে শুধু লক্ষ্যহীন, বাধাহীন মনেব আকুলি-ব্যাকুলি।

জর্জ্জ্যান্ নাট্য যে আবাব খানিকটা প্রপাগ্যাণ্ডিষ্ট্ হোয়ে উঠ্বে তাতে কিছুই আশ্চর্য্য নেই। এক কথায় বোলতে গেলে, যুদ্ধাবসানে মানুষেব চিন্তাব ও গোটা সামাজিক জীবনে যে প্রচণ্ড আলোড়ন-বিলোডন চলেছে, সেটাকে নাট্যকাব ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে খানিকটা বাক্য-বাগীশ হোয়ে পডেছেন। তাই তাদেব সবার-ই কিছু একটা বলবাব আছে, বোঝাবাব আছে। *Jonrney's End* বা *What Price Glory*? এই ধবণেব নাটকেই ও-ভাবটা খুবই স্পষ্ট হোয়ে উঠেচে।

আব একটা জিনিষও খুব স্পষ্ট হোয়েছিল—আট দশ বছব আগে—সেটা হচ্ছে সেক্স্-নাট্যে অরুচি। এ অরুচি দেখতে পাওয়া গেছে ক্রাইম্ এবং ক্রুক্ নাটকে। ১৯২৬ থেকে ১৯৩১ সাল অবধি এই বছব পাঁচেক ঐ-ধরণের নাটকই লণ্ডনের থিয়েটাবগুলিকে একেবাবে গ্রাস কোরে বসেছিল। কিন্তু ওটা ছিল নিতান্তই সাময়িক উত্তেজনা; তাই বেশি দিন টিকলো না।

এ থেকে বোঝা যায় যে, জর্জ্জ্যান্‌-নাট্য আগের-আগের যুগের নাটকের চাইতে গড়নে, ও ব্যঞ্জনায় অনেকটা পৃথক। ও 'মাষ্টার্‌পিসের' যুগ নয়, এখনও তাই প্রতিদিন নতুন নতুন নাটক রচিত হোচ্ছে নতুন নতুন থিয়েটারে। নাটক আজ কেবল পেশাদারী নাট্যকারের একচেটিয়া নয়, যদিও আশ্চর্য্য এই যে, পেশাদারী বুদ্ধিদ্বারাই ওদেশে আজকালকার নাটকাভিনয় সম্পূর্ণ ভাবে পরিচালিত।

আজ পাশ্চাত্য জগতে রঙ্গমঞ্চের উৎকর্ষ সাধন ক'রুচে মঞ্চশিল্পী ও ওস্তাদ, ও ক্ষেত্রে আনাড়ীর হাত দেওয়ার যো নেই। নাট্য-রচনা ও প্রযোজনার প্রত্যেকটী দিক্‌ ভালো ক'রে ফুটিয়ে তোলবার জন্য যে সব শিল্পী ওদেশে আজ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন তাঁরা তাঁদের কারুকলার সম্যক কদর ও দাম পেয়েছেন থিয়েটারব্যবসায়ীর কাছে। 'আর্ট ফর্‌ আর্টস্‌ সেইক্‌' কথাটা আজকালকার কম্যর্‌শিয়াল্‌ থিয়েটারের যুগে নিতান্তই অর্থহীন হোয়ে পড়েচে। তাতে আর্টের বিশেষ ক্ষতি হোয়েচে ব'লে মনে হয় না, বরঞ্চ আর্টিষ্ট্‌ তার কাজের মূল্য পাচ্ছে।

একটা নাটককে গড়ে-পিটে সাজিয়ে গুছিয়ে আজ এমন ক'রে ধ'রে দেওয়া হোচ্চে নাট্যামোদীর সামনে যে, সে যেন আর তাতে কোনো খুঁত না ধরতে পারে: সে যেন পয়সা খরচ ক'রে নাটক দেখে খুসি হয়ে বাড়ী ফেরে। জর্জ্জ্যান্‌ যুগের নাট্যকলায় তাই দেখতে পেয়েচি অভিনয়ের এমন সম্পূর্ণতা, নাট্য-প্রযোজনার এতটা সৌষ্ঠব।

মিউজিক্‌ল্‌ কমেডি, ক্রুক্‌ বা ডিটেক্‌টিভ্‌ নাট্য জর্জ্জ্যান্‌ যুগের শ্রেষ্ঠ দান নয়; আর যুদ্ধের পরে দশ বছর

ধরে ঝুড়ি-ঝুড়ি যে-সব সেক্স্-নাটক বেরিয়েছে, তাও নয়। অনাগত ভবিষ্যতে অমরত্বের আসন জুড়ে থাকবে বোধহয় ক'খানা নাটক যার ভেতর রইবে: শ'র খান দশেক, গল্স্ওয়ার্দ্দির খান চারেক, সিঙ্গের দু'খানা, আর এক একখানা করে বাদ বাকি আট ন' জনের—ব্যারি, ও'কেইসী, লন্স্ডেইল্, কাওযার্ড, মহ্ম্, ডিউকস্, ও'নীল, বেনেট্ ও মিল্ন্।

প্রুস্ত্ পরিচয়

বিংশ শতাব্দীর ফরাসী কথা-সাহিত্য-শিল্পীদের মধ্যে বোধহয় মার্সেল্ প্রুস্ত্-ই বাঙালী রসপিপাসুদের কাছে সব চেয়ে কম পরিচিত। আজকাল এ-দেশে অতি-আধুনিকদের মধ্যে ইয়োরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে মাঝে মাঝে অনেক উড়ো মতামত শুনতে পাই: দু'এক জনের মুখে প্রুস্তের নাম উচ্চারিত হোতে শুনেচি এবং কারুর কারুর লেখায় প্রুস্তের উল্লেখ-ও দেখেচি।

আনাতোল্ ফ্রাঁস্, ভিক্তর্ হুগো, বা মোপাসঁ-র মতো প্রুস্ত্ এখনও আমাদের বুক-শেল্‌ফে অতটা জায়গা পায় নি। স্কট্ মন্‌ক্রিফ্ অনূদিত প্রুস্তের উপন্যাস গুলির ইংরেজি সংস্করণও অতি অল্পদিন হয় বেরিয়েচে, অন্যান্য আধুনিক বেস্ট্-সেলারের মতো প্রুস্তের বইর তেমন কাট্‌তি-ও নেই এদেশে।

প্রুস্তের বইর বিশেষত্ব এই যে তা মোটেই হাল্‌কা লেখা নয়, কাজেই সহজ-পাঠ্য নয়। এড্‌গার্ ওয়ালেসের ক্রুক্ বা ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাসের মতো প্রুস্তের বই এক বৈঠকে শেষ ক'রে ফেলা যায় না: অলস মন নিয়ে সময় কাটাবার মাল-মশ্‌লা প্রুস্তের বইতে একরকম নেই বল্‌লেই চলে। মানব-মস্তিষ্কের প্রবলতা ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির উজ্জ্বলতাকে-ও প্রুস্ত্ নাস্তানাবুদ কোরে দেওয়ার উপক্রম করেচেন।

বিশেষ ভাবে, বর্ত্তমান যুগে প্যারিসের যে-নমুনার

সমাজ ও নর-নারী নিয়ে প্রুস্তের সমস্ত উপন্যাসগুলো লেখা, সে-সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও আবার তাঁর বই নিয়ে কোনো পাঠকের বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। প্রুস্ত্‌কে বুঝতে হোলে কেবল রসবেত্তা হোলেই চলবে না, আধুনিকতম ফরাসী সমাজের অনুসন্ধানী হোতে হবে।

ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সে ও ফ্রান্সের বাইরে প্রুস্তের যতটা চল ছিল ও এখনো আছে, এতটা বোধ হয় আর কোনো ইয়োরোপীয়ান্ লেখকেরই ছিল না এবং নেই। মার্‌সেল্ প্রুস্ত্ এ পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন মাত্র একান্ন বছর: ১০ই জুলাই ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে তাঁর জন্ম এবং ১৯২২ সালের ১৮ই নোভেম্বর্ প্যারিসেই তাঁর মৃত্যু। এই একান্ন বছরের ভেতর মাত্র পনের কী ষোলো বছর তিনি সত্যিকারের সাহিত্য সেবা কোরেছিলেন এবং তা-ও জীবনের শেষ দিক্‌টাতে।

মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রুস্ত্ উপন্যাস-রচনাতেই নিবিষ্ট ছিলেন: সাহিত্যক্ষেত্রে যে তাঁর দানের মূল্য ও প্রয়োজন আছে সেটা তিনি বুঝেই ছিলেন মরবার মাত্র কয়েক বছর আগে। অবিশ্যি, পঁচিশ বছর বয়েসে তিনি একটা বই লিখে-ও ছিলেন: *Les Plaisirs et les Jours* (সম্ভোগ ও কাল), এবং এই বইটার একটা প্রশংসাপূর্ণ মুখপত্র-ও আনাতোল্ ফ্রাঁস্ লিখে দিয়েছিলেন। যে-সব পাঠক এই বইটার ভেতর প্রুস্তের প্রতিভার একটু একটু পরিচয় পেয়েছিল তার পরে প্রুস্তের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল।

"সম্ভোগ ও কাল" বেরুবার পর প্রুস্তের জীবনের প্রায়

ষোলো বছর সাহিত্যের দিক্ দিয়ে ছিল একেবারে ফাঁকা; কিন্তু তখনকারদিনের প্যারিসে ধনী, সম্ভ্রান্ত, বিলাসী সমাজের শীর্ষস্থানীয় এমন কেউ ছিল না যে প্রুস্ত্‌কে চিন্‌তো না। কেননা, ঐ উচ্চবিত্ত, সম্ভোগলিপ্ত ফরাসী সমাজের ভেতরেই ছিল তাঁর যাতায়াত ও প্রতিপত্তি।

প্যারিসের সাহিত্যিক বৈঠকগুলিতে অবিশ্যি প্রুস্ত্‌কে বিশেষ কেউই চিন্‌তো না, কিন্তু ফিটফাট্, ফুট্‌ফুটে বাবু ব'লে, আদব-কায়দায় দুরস্ত, চাল্‌চলন্তিতে ওস্তাদ যুবক প্রুস্ত্‌কে কে না জানতো? কোনো পার্টিতে প্রুস্তের চাইতে হাস্যরসিক বাক্যশিল্পী কেউ ছিল না; আর তাঁর চাইতে বেশী দিলখোলা, সহানুভূতিপূর্ণ শ্রোতাও কেউ ছিল না। বন্ধুবান্ধব অন্তরঙ্গদের জাঁকজমক ক'রে আপ্যায়িত ক'রতে আবার প্রুস্তের তুল্য প্যারিসে তখনকারদিনে কেউ ছিল না।

প্রুস্ত্ যখন কোনো খুব সৌখীন হোটেলে প্রবেশ ক'রতেন, তাঁকে খুসী করবার জন্যে হন্তদন্ত হোয়ে উঠতো হোটেলের ম্যানেজার থেকে আরম্ভ ক'রে চাকর-বাকর পর্য্যন্ত: বোধহয় কোনো আমেরিকান্ ধনকুবেরের-ও সেখানে এতো সমাদর হোতো না। বাজারের সব চেয়ে যা ভালো জিনিষ—খাদ্য, দ্রব্য, পানীয়, পরিধেয় যাই হোক্ না কেন—এমন কিছুই ছিল না যা প্রুস্তের পয়সা, খেয়াল ও রুচির ছিল বাইরে।

প্রুস্তের এই হাতখোলা, দিলখোলা চালচলন প্যারিসের সবচেয়ে পয়সায় বড়, নামে বড় লোকদের হার মানিয়ে দিতো। সামাজিক আদব-কায়দা, ঠাট-ঠমকের খুঁটি-

নাটিগুলি পর্য্যন্ত ছিল তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে; কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রুস্ত্ দেখতে খুব ভালো ছিলেন না এবং খুব উচ্চবংশের সন্তান-ও তিনি ছিলেন না। অবিশ্যি পয়সা তাঁর প্রচুরই ছিল, কিন্তু সে প্রচুরতার বহর অফুরন্ত ছিল না। আর এক হিসেবে তাঁর মা ইহুদী বংশীয় ব'লে প্যারিসের উচ্চাঙ্গের সমাজে আদর লাভ করার পক্ষে খানিকটা তাঁর অসুবিধেই হোয়েছিল। কাজেই যে-স্তরের সমাজে তাঁর জন্ম তার চাইতে উঁচু-স্তরের সমাজের ভেতর স্থান লাভ করা, কেবল স্থান লাভ করা নয়, তাকে সম্পূর্ণ ভাবে জয় করা সাধারণের চোখে একটু অদ্ভুতই ঠেক্‌তো।

কিন্তু, যারা প্রুস্তের ভেতরটার সঠিক পরিচয় পেয়েছিল তারা জানতো কী অসাধারণ অমায়িকতা ও উদারতা দিয়ে মানুষটা গড়া। বাইরের ঠুন্‌কো চাকচিক্যের বিক্ত-তাকে প্রুস্ত্ জয় করেছিলেন বুদ্ধির অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা দিয়ে : অন্তরের অফুরন্ত বিত্ত দিয়ে। প্রুস্তের হৃদয়টা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে মোহ-বিমুখ : ব্যসন সামগ্রীর ঠাট-ঠমক তা'কে একদিনের জন্যও মলিন কোরতে পারেনি।

মার্‌সেল প্রুস্ত্ তাঁর প্রায় সমস্তটা জীবন যে-সমাজের ভেতর অতিবাহিত কোরে গেছেন, যার অন্তর-বাহির পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে দীর্ঘকাল ধ'রে আত্মবিস্মৃতের মতো যার ভেতর পর্য্যটন করেছেন, যার সব কিছুই বহুবার-পড়া বইর মতো তাঁর ছিল কণ্ঠস্থ, সেই সমাজটারই একটা বিস্তৃত চিত্র আমরা পাই তাঁর তিন বিরাট হ্বল্যুমে-সম্পূর্ণ দশ-খণ্ডে-বিভক্ত দীর্ঘ-কলেবর উপন্যাসে—

A la recherche du temps perdu (অতীত দিনের স্মৃতি)।

এই বইতে যে-সমাজটা অঙ্কিত র'য়েছে সেটা হোচ্ছে প্যারিসের ধনী ও বিলাসী অথচ নিষ্কর্ম্মণ্য নর-নারীর সমাজ : এতে দু'প্রকৃতির লোকেরই আধিক্য দেখতে পাওয়া যায় : একদল গর্ব্বিত, আত্মাভিমানী, উন্নাসিক মেয়ে-পুরুষ, যাদের 'স্নব্' বলে : আর এক দল অসহ্য-রকমের বাক্যবাগীশ, হাল্‌কা, ছ্যাব্‌লা, দস্তুর-মতো বিরক্তিদায়ক তরুণ-তরুণী ও প্রৌঢ়-বৃদ্ধ, যাদের সাধারণতঃ লোকে 'ব্যব্' আখ্যা দিয়ে থাকে।

'স্নব্' এবং 'ব্যব্' এই দুই শ্রেণীরই বেশীর ভাগ লোকের সম্মেলনে বর্ত্তমান যুগে প্যারিসে যে-একটা অদ্ভুত সমাজের সৃষ্টি হোয়েচে, তারই জীবন-প্রবাহের প্রণালী, গতিবিধি, আদব-কায়দা ও চিন্তাধারা প্রুস্ত্ তাঁর এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ কোরেচেন। এই সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে নিশিদিন এতবার চোখে দেখবার ও এত হরেক রকমে বুঝে নেওয়ার সুবিধে বোধহয় প্রুস্ত্ ছাড়া আর কোনো আধুনিক ঔপন্যাসিকের হয় নি।

উন্নাসিকদের দুর্ণিবার চটুলতা, ভালোবাসার ভাণ, ভাব-নিয়ে-লুকোচুরি, মন-নিয়ে-টানা-হেঁচ্‌ড়া ও প্রেম-নিয়ে-কাড়াকাড়ি, আর 'ব্যব'দের ভ্যাপ্‌সা, অন্তঃসারশূন্য নির্লজ্জতা এবং অকিঞ্চিৎকর, অতিষ্ঠকর, ন্যাকামি আজ পর্য্যন্ত প্রুস্তের চাইতে বেশী স্পষ্ট ক'রে, প্রাঞ্জল ক'রে, আর কোনো ফরাসী কথা সাহিত্য-শিল্পীই দেখাতে পারেন নি।

প্রুস্তের "অতীত দিনের স্মৃতিকে" সামাজিক উপন্যাস বল্‌লেই তার যথেষ্ট পরিচয় হয় না। কেননা, যদিও বইটা

পুরোপুরিভাবেই সামাজিক জীবন-প্রবাহের কাহিনী, তবুও তার ওপর যে-জিনিষটার সব চেয়ে বেশী ছায়া পড়েচে, তা মোটেই সামাজিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে-জিনিষটা হোচ্চে প্রুস্তের নিজের জীবনধারার-ই নিছক বিবৃতি ও বিশ্লেষণ।

যদি এই উপন্যাসখানা শুধু একটা সামাজিক নক্সাই হোতো তা হোলে বোধহয় সেটা এতদিনে অন্যান্য সামাজিক উপন্যাসের মতো কালস্রোতের অগণিত ঢেউয়ের মাঝে হোতো শুধু একটা ঢেউ; কিন্তু প্রুস্তের নিজেব দেহ, মন ও আত্মা তাদের নিজেদেব আলাদা-আলাদা, অথচ সম্মিলিত অস্তিত্বেব ছাপ তাব উপর লাগিযে দিয়ে, চিবকালেব মতো তা'কে অমব সাহিত্যেব অন্তর্গত ক'বে রেখে গেছে।

মনস্তত্ত্ববিদেবা এইখানে হয়তো প্রশ্ন তুলবেন: একখানা সামাজিক উপন্যাস বচনার জন্য একজন লেখককে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ সৌখিন সমাজের ফুব-ফুবে হাওয়ায এম্নি ক'রে কাটিয়ে দেওয়ার কী সত্যি কোনো প্রয়োজন ছিল? জীবন, যৌবন, ধন একটা ঠুন্‌কো পদার্থহীন, আত্মাহীন সমাজের বেদীতে কী এমনিভাবে তাঁর উৎসর্গ কবা উচিত হোয়েচে?

বাইরে থেকে দেখ্‌তে গেলে ঐ সম্ভোগ-স্পৃহালিপ্ত, বিলাস-ব্যসনাসক্ত, কেবল বাহ্যিক চটকদাবিতে আক্রান্ত সমাজেবই উপাসক বোলে প্রুস্ত্‌কে মনে হোতে পাবে। এমনকি প্রুস্তের মৃত্যুর আগেও একথা কারুর মনে হয়নি: কেন, কী প্রয়োজনে, কী উদ্দেশ্যে তিনি ঐ সমাজের পায়ে উচ্ছৃঙ্খলেব মতো জীবনটা জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

তিনি শুধু উচ্চাঙ্গের সমাজের আদব-কায়দা আয়ত্ব করবার জন্যই এতটা পাগলামি ক'রেছিলেন? কিন্তু এখন সবাই বুঝতে পেরেচে যে খাঁটি সমাজ-তত্ত্ব-জ্ঞানীর পারদর্শিতা অর্জ্জন করবার জন্যেই তাঁকে এত মেহনত ক'রতে হোয়েছিল। যে-ধরণের নর-নারীর জীবনের ব্যবহারিক এবং মানসিক অবস্থা তিনি তাঁর উপন্যাসে বিশ্লেষণ করেচেন, তাদেরই সঙ্গে নিজের জীবনযাত্রা যদি তিনি সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে না দিতেন তবে তিনি কিছুতেই সত্যিকারের অভিজ্ঞতা লাভ ক'রতে পারতেন না। এ হোচ্চে বাস্তবতার সাধনা: ওর ভিতরে 'স্ন্যাডো' বস্তুটি একেবারেই নেই।

প্রুস্তের প্রাণটা ছিল খাঁটি শিল্পীর প্রাণ। সমাজের অসংখ্য জাঁক-জমক ও চাল-চুলোর চাপেও তাঁর প্রাণের সচ্ছন্দ গতি একদিনের জন্যেও ব্যাহত হোতে পারেনি। তার ওপর প্রুস্তের অন্তর্দৃষ্টি ছিল এত তীক্ষ্ণ যে, কোনো কিছুই তা এড়িয়ে যেতে পারতো না: হয়তো বা কোনো তরুণীর নীচের পুরু ঠোঁটটায় একটা লুব্ধতার দৃষ্টি, হয়তো বা কারুর হঠাৎ সংক্ষিপ্ত-হয়ে-যাওয়া থুতমোটার দৃঢ়-চিত্ততাব্যঞ্জক অভিব্যক্তি: সব কিছু খুঁটিনাটীই প্রুস্তের অঙ্কিত চিত্র-গুলিতে জ্যান্ত ও বাস্তব হোয়ে ফুটে উঠেচে। প্রুস্তের সাহিত্যে তাই পাওয়া যায় একটা সুদৃঢ় প্রত্যয়ের তেজ: তাতে সন্দিগ্ধতার দুর্ব্বলতা নেই। প্রুস্তের এ-পরিচয়ই আসল পরিচয়।

ছেলেবেলা থেকেই প্রুস্ত্ ছিলেন বড় রুগ্ন। ন'বছর বয়সে যে নিদারুণ হাঁপানির ব্যাধিতে তাঁকে ধরেছিল, দিনের পর দিন একটু একটু ক'রে তা তাঁকে মরণের পথে এগিয়ে

দিচ্ছিলো। শিশুকাল অবধি সংসারের অনেক জিনিষই ছিল তাঁর সামর্থ্যের বাইরে ঃ বিদেশ-ভ্রমণ, খেলা-ধূলা, সর্ব্ব-প্রকার শারীরিক পরিশ্রম। রূপগন্ধময়ী প্রকৃতির জগতটা-ও ছিল তাঁর কাছে এক রকম অভুক্ত, অনাস্বাদিত। শোনা যায় নাকি, বাগানের ফুলের গন্ধ নাকে গেলেই তাঁর রোগ বেড়ে যেতো। এমনকি বসবার ঘবে ফুলদানীর ফুলেব ওপরে দৃষ্টি পডলেও নাকি তাঁব বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠতো। এ জগতে যে-সব জিনিষ ছিল তাব না পাওযা, উপভোগ্যতাব বাইরে, সেগুলিব ওপবই দেখতে পাই তাঁর উপন্যাসে উচ্ছ্বসিত আবেগের নির্ঝর।

একদিকে উপভোগেব ক্ষমতা যে-অনুপাতে তাঁর কম ছিল, সেই অনুপাতে বেশী ছিল মানুষেব আবযবিক ও ব্যবহাবিক ভাব-ভঙ্গি বুঝবার ক্ষমতা প্রুস্তের। এমনকি কোনো মানুষের চেযারে-বসা বা চেযার-ছেড়ে-ওঠা, এরূপ একটা সামান্য আবয়িব অবস্থার-ও সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তি তাঁর দৃষ্টি স্পর্শ ক'রতো; এবং স্পর্শ করা মাত্রই তা তাঁব অন্তস্তলের বন্দিশালায় চিবদিনেব মতো আটক র'যে যেতো। কোন্ তরুণীব মুখে, গলায ও ঠোঁটে টাট্‌কা রক্তেব গাঢ় বক্তিমার ছিটে, তা শুধু দুটী লাইনের ফাঁকে এমন বঞ্জিত ক'বে আঁকতে প্রুস্ত্ ছাড়া আর কে কবে পেবেচে ?

তাঁর উপন্যাসের একটী নাযক কাউন্ট্ নব্‌পোয়া এক জায়গাতে প্রায় পঞ্চাশ পাতা ধ'বে শুধু একাই কথা ব'লে গেছে ; অথচ তার প্রতিমুহূর্ত্তের প্রতিটি নিশ্বাস-ফেলা, গলা-খ্যাঁকৃরি পর্য্যন্ত প্রুস্তের লেখায় বাদ পড়েনি। প্রুস্তের সদা-সচকিত বহির্দৃষ্টি ও ঘুম-ভোলা অন্তর্দৃষ্টি

তাঁর শারীরিক অপারগতাকে জীবনের প্রতি মুহূর্তে হার মানিয়েচে।

প্রতি রাত্রে যখন নিজের অবসন্ন ক্লান্ত দেহটা নিয়ে বাড়ী ফির্‌তেন তখনো তাঁর সজাগ মন তাঁকে মুহূর্তের অব্যাহতি দিতো না: বিছানায় শুয়ে'ও তাঁর চোখে ঘুম আসতো না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না, শুয়ে-শুয়েই, ছোট ছোট কাগজের টুকরোতে, লিখে ফেলতেন তাঁর প্রতিদিনরজনীর কাহিনী: যা যা শুনেচেন, দেখেচেন: কখন কোন্ তরুণের হাসি শুক্‌নো লেগেছিল, কখন কোন্ তরুণীর চুলের খোঁপায় ক'টা ফুল দেখেছিলেন, কখন কোন্ বিলাসীর কণ্ঠস্বরে রিক্ততার দৈন্য ঝরে পড়েছিল, কখন কোন্ বিলাসিনীর চোখ-চাওয়ায় করুণতার কার্পণ্য উগ্র হোয়ে উঠেছিল।

এই ভাবে, প্রতি রাত্রে, সেই ছোট কাগজের টুকরোগুলি জম্‌তে থাকতো, এবং প্রুস্তের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাব্য তিলে-তিলে, পলে পলে গড়ে উঠেছিল ঐ ছোট রেখাচিত্র জড়ো হোয়েই। জীবিত কালে যেমন তাঁর মন তাঁকে মুহূর্তের বিরাম দেয়নি, মৃত্যুর মুহূর্তে হাপানীতে জর্জ্জর কম্পমান দেহটার ওপরও সে কোনো কৃপা করেনি।

ফোবুর্গ স্ঁা জ্যার্ইম্যাঁর অভিজাত সমাজে তখনকার দিনে প্রুস্তের মতো অনেকেই বোধহয় আনাগোনা কোরতো; কিন্তু তাদের সবাইর সঙ্গে প্রুস্তের তফাৎ ছিল এই যে, প্রুসতের অন্তরে বহ্নিশিখার মতো জ্বলতো একটা প্রচণ্ড জ্ঞান-ক্ষুধা; আর তাদের ছিল কেবল আমোদ-প্রমোদের খোঁজ এবং উপভোগান্তে রজনীর সুখশয্যা। কিন্তু প্যারিসের

রাত্রির নীরবতার মাঝে জেগে থাকতো কেবল প্রুস্তের অশান্ত মন: অতৃপ্ত শিল্প-সৃষ্টির বেদনা।

এই সমাজটার সঙ্গে সব সম্পর্ক একদিন প্রুস্ত্ হঠাৎ চুকিয়ে দিলেন: বুঝতে পারলেন তাঁর মরণের দিন ঘনিয়ে আসচে; তাঁর কথা-কাব্য তখনও লেখা হয় নি।

তাই, একদিন বাড়ীর সব দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে শয্যায় আশ্রয় নিলেন। দিনের বেলা শয্যা আর ছাড়েন না; ছাড়বার ক্ষমতাও তাঁর শরীরে নেই। রাত্রি হোলে উঠে বসেন: রোগের যন্ত্রণা ভুলে যান: লিখ্তে আরম্ভ করেন। লিখ্তে লিখ্তে যখন একটু ক্লান্ত হোয়ে পড়েন, চাকরকে বলেন রাত্রির পোষাক পরিয়ে দিতে। গায়ে জ্বর: ভ্রূক্ষেপই নেই: বেরিয়ে যান কোনো একটা সৌখীন হোটেলের দিকে। দূর থেকে দেখে আসেন, ক্ষণিকের জন্য, তাঁর চিরপরিচিত বিলাসের ছবি; কিন্তু যাদের সঙ্গে এতকাল ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করেচেন তাদের কারুর সঙ্গে আর দেখা করেন না।

কোনো এক রাত্রে হয়তো খেয়ালের মাথায় চলে যান প্যারিসের কোনো এক সুন্দরী গণিকার গৃহে: যাকে বহুবছর আগে একবার বোয়া দ্য বুলোনে দেখেছিলেন এক অপরূপ ভঙ্গীতে টুপি পরতে: মনে ইচ্ছা এই যে, রূপসীর সে-ভঙ্গীটা আর একবার সামনা-সামনি দেখে আসবেন: নইলে কী করে তিনি পারবেন বর্ণনা ক'রতে তাঁর উপন্যাসের নায়িকা ওদেত্-এর টুপি-পরার কায়দাটা।

এমনি করে ১৯১২ সালে উপন্যাসটা একরকম মনের জোরেই প্রুস্ত্ শেষ ক'রে ফেললেন। লিখ্তে তাঁর ঠিক

পুরো দু'বছর লাগলো। বইটা শেষ কোরেই মহা মুস্কিলে পড়লেন যে কে তাঁর বই ছাপবে? বেয়াল্লিশ বছর বয়েসের অখ্যাত এক লেখকের বই কী কোনো প্রকাশক বার কোরতে রাজি হয়? আরও বিশেষ কোরে প্যারিসের সাহিত্য-জগতে প্রুস্তের বিশেষ সুনাম ছিল না: সাধারণ লোক জান্‌তো তাঁকে 'ফিগারো' পত্রিকার গ্যসিপ্‌ কলামের লেখক ব'লেই। *Nouvelle Revue Francaise*-এর ম্যানেজার আঁদ্রে জিদ্‌-কে বইর পাণ্ডুলিপি দেখাতে ঘাড় নাড়লেন: তথৈবচ *Mercure de France*-এর কর্তারা। অবশেষে রাজি হোলো ছাপাতে, প্রায় এক বছর টানা-হেঁচড়ার পর, অজ্ঞাত, অখ্যাত এক প্রকাশক। আজ অবিশ্যি সে মার্‌সেল্‌ প্রুস্তের কল্যাণে খুব বড় লোক হোয়ে গেছে।

বইর প্রথম খণ্ড বেরুতে না বেরুতেই লেগে গেলো ইয়োরোপে লড়াই। লড়াই থেমে যাওয়ার পর একে-একে আরও পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হোলো। তখন থেকে সুরু হলো প্রুস্তের বিজয়-যাত্রা: তা আর কেউ প্রতিহত ক'রতে পারে নি।

প্রুস্তের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই অনূ্যন প্রায় ছ'খানা জীবনী বেরিয়েছিল। তার ভেতর প্রুস্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাচেস্‌ অফ্‌ শেয়ারমঁ তাঁর বইতে সুধু প্রুস্তের জীবনের কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ ঘটনা বিবৃত কোরেচেন। ম্যসিয়্য লেইয়ঁ পীয়ের্‌ কঁ্যাজ্‌-এর জীবনীখানাই বেশী ব্যাপক ও তথ্যপূর্ণ। এই বইটাতে প্রুস্তের সমগ্র জীবন-ধারার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক একটা ধারাবাহিক ইতিহাস র'য়েচে।

আজকালকার দিনে অনেক সমালোচক মনস্তত্ত্ব

বিশ্লেষণের দিক্ দিয়ে প্রুসতের মৌলিকতা মানতে চান না ;
তাদের বক্তব্য এই যে, প্রুস্ত্-অঙ্কিত মানব-মনের নক্সাগুলি
কেবল প্রুস্তের নিজের পরিচিত ও চেনা-জানা কতগুলি
মানুষের ভাবভঙ্গি ও হৃদয়ের অভিব্যক্তি থেকে ধার কোরে
নেওয়া। কাজেই, সেগুলোতে প্রুস্তের নিজের বাহাদুরী বা
বিশেষত্ব কিছুই নেই : যেমন, কোনো ফোটোগ্রাফার তার
নিজের ক্যামেরায়-তোলা জিনিষের সৌন্দর্য্যের বা বিশেষত্বের
বড়াই কোরতে পারে না। তার যেটুকু বাহাদুরী সেটুকু তার
ভালো ছবি তোলারই বাহাদুরী।

অবিশ্যি এ কথা সত্যি যে, প্রুস্ত্ তাঁর উপন্যাসে যে-সব
চরিত্র এঁকেছেন, তারা বেশীর ভাগই প্রুস্তের জানাশুনো
মানুষের প্রতিকৃতিরই অনুরূপ। এমনকি, অনেকগুলি
চরিত্রের সঙ্গে কোনো কোনো জীবিত লোকের সাদৃশ্য-ও
অনেক পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ-কথা
কিছুতেই ভুললে চলবে না যে, মার্সেল্ প্রুস্তের কথা-শিল্পে
সব চেয়ে যে গুণটা বেশী পরিমাণে র'য়েচে, সেটা হোচ্ছে
তাঁর নিজের মনটাকে উপন্যাসের মাল-মশলা ও বর্ণিতব্য
অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কোরে নেওয়ার ক্ষমতা।

অনেক চোখে-দেখা জিনিষই প্রুস্তের মনে গাঁথা
থাকতো ; কিন্তু রচনাকালে সে জিনিষগুলি সময়ের দূরত্বে ও
মনের ব্যবধানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ ধারণ কোরতো। প্রুস্ত্
সম্বন্ধে একথাটা বুঝতে না পারলে তাঁর সাহিত্য-শিল্পের
কোনো পরিচয় হওয়া সম্ভব নয়।

প্রুস্তের চোখ দুটো ছিল অনুবীক্ষণের মতো ;
কিন্তু মনটা ছিল অনুবীক্ষণের চাইতেও সুতীক্ষ্ণ ; তাতে

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিষও ধরা পড়তো। মানুষের বাসনা-কামনা, হিংসা-দ্বেষ, অহঙ্কার, উচ্চাভিলাষ, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, এ সমস্ত জিনিষগুলো নিয়েই মনস্তত্ত্ববিদরা নাড়াচাড়া কোরে থাকেন; এবং সেই হিসেবে প্রুস্ত্‌কে মনস্তত্ত্ববিদ ব'লে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু প্রুস্ত্‌ তো কেবল মনস্তাত্ত্বিকই ছিলেন না: তিনি ছিলেন শিল্পী-ও এবং এমন শিল্পী যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বাইরে যা র'য়েচে তা-ও দেখ্‌তে পারে।

প্রুস্ত্‌ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান, অন্ততঃ ফরাসী ভাষানভিজ্ঞ লোকের কাছে, তাঁর উপন্যাসের ইংরেজিতে অনূদিত বইগুলি থেকে, বিশেষ ক'রে এই তিনখানা: *Le cote de chez Swann* (সোয়ানের গৃহাভিমুখে), *Le cote de guermantes* (গ্যার্‌ম্ঁত্‌ পরিবারের গৃহাভিমুখে) এবং *A l' Ombre des jeunes filles en fleurs* (আধ-ফোটা ফুলের নিকুঞ্জ-ছায়ে)। শেষোক্ত খণ্ড প্যারিস্‌ সাহিত্য-জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'প্রি গোঁকুর্‌' পেয়েছিল।

আলাদা-আলাদা কোবে "অতীত দিনের স্মৃতি"-র শুধু এই তিনটি অংশ পড়লে প্রুস্ত্‌ সম্বন্ধে কতগুলি ভুল ধারণা হওয়া সম্ভব। প্রথমতঃ, সহজেই মনে হোতে পারে: প্রুস্ত্‌ বোধ হয় কতগুলি 'স্নব্‌'-'ব্যব্‌' জাতীয় নর-নারীর চরিত্র দিয়েই তাঁর উপন্যাস ভ'রেচেন, আর, এ-ও মনে হোতে পারে যে, প্রুস্তের মতো প্রতিভাশালী কথা-শিল্পী, এই ধরণেরই মানুষ যে জগতের বাসিন্দা, তার ভেতর এমনকি সাহিত্যিক মাল-মশলা খুঁজে পেলেন? যে-সব মানুষ শুধু ক্ষণিকের উত্তেজনার পেছনে পাগলের মতো ছুটোছুটি কোর্‌চে, তাদের ভেতরে এমনকি পদার্থ র'য়েচে যার বিশ্লেষণে বিশ্বমানবের রস-

বোধের সাড়া পাওয়া যায়? তার ওপর, উন্নাসিকতা জিনিষটা-ও একটা দুরারোগ্য ব্যাধিরই মতো : যাকে একবার ধরে, পেয়ে বসে : তার বুদ্ধি, বিচার, আচার, ব্যবহার সবই।

উন্নাসিকের কাছে ভালোবাসা জিনিষটার মানে হোচ্ছে ভাণ; ভাণ কোর্‌তে কোর্‌তে সেটা তার এমন কায়েমী হোয়ে পড়েচে যে, ও জিনিষটাকেই সে সত্যি ব'লে স্বীকার কোরতে শিখেচে। কথার ছলে, কী অন্য কোনো ফাঁকে যদি তার নিজের আসল রূপ বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হয়, তবে তখন তার মানসিক উদ্বেগের আর সীমা থাকে না। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এটাই হচ্ছে তার সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থা; কেননা, সে সর্ব্বদা ঐ নিয়েই একটা সজ্ঞান অভিনয়ের পালা কোরচে। এই জাতীয় মানুষের সব ব্যাপারই শেষে গিয়ে চোরাবালিতে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেল্‌চে : সেখানে আলোর উগ্রতা আছে, কিন্তু উত্তাপ একরকম নেই বল্‌লেই হয়, আর যেটুকু আছে তাতে প্রাণ বাঁচে না, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

এই সমাজের চিত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে হয়তো প্রুস্ত্‌-পাঠক প্রুস্ত্‌কেও উন্নাসিকতা-বিদ্যায় ওস্তাদ ব'লে ফস্‌ কোরে মত প্রকাশ কোরে বসবেন, এবং এই-খানেই হবে তার সব চেয়ে বড় ভুল। প্রুস্ত্‌ নিজে উন্নাসিক ছিলেন না; উন্নাসিকতার ভাণও কোরতেন না : ও-জিনিষটা ছিল তাঁর বহিরাবরণ। সে-আবরণ উন্মোচন কোরলে দেখতে পাওয়া যেতো তাঁর শিল্পীর প্রাণ—যার ওপর কৃত্রিমতার কোনো পোঁচই পড়েনি।

তাই অনেকে যে প্রুস্ত্‌কে 'মরালিষ্ট' আখ্যা দিয়েচেন,

সেটা এক হিসেবে খুবই সত্যি। অন্তঃসারশূন্য, বাহ্যিক ঠাট-ঠমকে ভরা জীবন-ধারার হুবহু ছবি এঁকে তিনি এইটেই বেশী কোরে দেখাতে চেয়েচেন যে, জাঁক-জমকের আতিশয্যমাত্রই হৃদয়ের দারিদ্র্যের পরিচায়ক; আর এ কথাও স্পষ্ট কোরে বুঝিয়েচেন যে, মানুষের মনে যদি সত্যিকারের রস-পিপাসা থাকে তবে কোনো সমাজই, তা যত মাপাজোকাই হোক্ না কেন, তাকে কখনো, কোনো অবস্থাতেই, আটকে রাখতে পাবে না।

তাই প্রুস্ত্ বল্‌চেন: পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় কোর্‌তে হোলে মানুষের একদিকে যেমন চাই ইন্দ্রিয়ের চেতনার বাইবে একটা কঠোব, সংশয়াতীত, ক্ষুরধার বুদ্ধি, তেমনি অন্যদিকে তাব চাই মনকে সংসাবের ক্ষণ-বিহারী মায়ার খেলা থেকে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত রেখে নিজে আত্মস্থ থাকা। সুতীক্ষ্ণ, পরিমার্জ্জিত ও সুনিশ্চিত বুদ্ধি এবং নিরাসক্ত মনের পরিচয় পাই প্রুস্তের কথা-কাব্যের প্রত্যেক আখ্যানের পাতায়-পাতায়, ছত্রে-ছত্রে।

ঘরে-ও নহে পারে-ও নহে

যে-যুগে ডি এইচ্ লরেন্সের সাহিত্যের জন্ম ও বিকাশ সেটা বিদ্রোহের যুগ, বাঁধন-ছেঁড়ার যুগ। এর ভেতর প্রচলিত সমাজের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ততটা নেই, যতটা র'য়েচে আর্ট ও সাহিত্যের ধরা-বাঁধা, মাপা-জোকা শাসন-অনুশাসনের প্রতি আক্রমণ। নবযুগের বিদ্রোহী সাহিত্যিকদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার অনিয়ম একরকম নেই বল্‌লেই হয়: তাঁদের প্রচেষ্টা হোয়েচে মানুষের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিসম্ভূত চিন্তাধারা, রুচি ও অভ্যাসের কুসংস্কার গুলিকে নির্ম্মম ভাবে আঘাত করা; বিশেষ কোরে সাহিত্যকে প্রচলিত আইন-কানুন মেজাজ-মর্জ্জির জবরদস্তি থেকে উদ্ধার করা। এই প্রচেষ্টায় বিংশ শতাব্দীতে যে ক'জন সাহিত্য-শিল্পী আত্মনিয়োগ কোরেচেন তার ভেতর ডি এইচ্ লরেন্স্ই সব চেয়ে বেশী বাইরের জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেচেন।

ইয়োরোপের মহাসমরের অবসানে ইংল্যাণ্ড্ ও ইয়োরোপের লোকদের মনের অবস্থা যেরূপ হোয়ে দাঁড়িয়েছিল সেরূপ অবস্থার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিশ্লেষণই ডি এইচ্ লরেন্সের লেখায় বেশী দেখ্‌তে পাই। অনেক বিষয়ে ডি এইচ্ লরেন্সের রচনা তাই ব্যঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্গত হোয়ে পড়ে। সাধারণতঃ যে-সব উপাদান ব্যঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত—কটু, তিক্ত, শ্লেষব্যঞ্জক লিখনভঙ্গী, ভাষার নির্ম্মম, ক্ষমাহীন তাচ্ছিল্য, ও ভাবের নিষ্ঠুর, তীব্র বিদ্রূপ—এ-সবই ডি এইচ্ লরেন্সের

লেখায়, বিশেষ কোরে, তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধে, খুব বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

লরেন্‌সের উপন্যাসের ভেতর *Sons and Lovers*, *St Mawr*, *The Plumed Serpent*, *Aaron's Rod*ই সব-চেয়ে বেশী তাঁর বিশিষ্ট রচনা-পদ্ধতির পরিচায়ক। লরেন্‌সের সমসাময়িক যে ক'জন সাহিত্য-শিল্পী আধুনিক ব্যঙ্গ-সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি কোরেচেন, তাঁদের ভেতরে জেইম্‌স্‌ জয়্যস্‌, অলড্যাস্‌ হাক্‌স্‌লি, ডরথি রিচার্ড্‌সন্‌, হ্ব্যর্‌জিনিয়া উল্‌ফ্‌, সের্‌উড্‌ এ্যান্‌ডার্‌সন্‌ ও থিওডোর ড্রাইজার—এঁদেরই নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সবাইর কথা-সাহিত্যে যে-জিনিষটা সব সময় চোখে পড়ে সেটা হোচ্চে মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত আচার-ব্যবহার, কর্ম্ম, চিন্তা; এবং দেহ ও মনের সর্ব্বপ্রকার অবস্থা ও অভিব্যক্তির খোলাখুলি বিশ্লেষণ।

ডি এইচ্‌ লরেন্‌স্‌ প্রমুখ আধুনিক লেখকদের লেখা পড়লে মনে হয় তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষের ভাববিলাসিতা, কবিত্বপ্রিয়তা, ও-সব বস্তুকে উষ্ণ মস্তিষ্কের বিকৃতি ব'লে উড়িয়ে দিয়েচেন। সে-সব লেখায় রঙীন কল্পনার আমেজ নেই, ফুর্‌ফুরে হাওয়ার অলস মদিরতা নেই: আছে শুধু একটা রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, নিরেট দৃঢ়তা। তাঁদের বিদ্রোহের পাশুপত অস্ত্রের নাম 'সিনিসিজ্‌ম্‌': ঔদাসীন্য দেখিয়ে, বিদ্রূপ কোরে, ঠাট্টা কোরে, ভাব-বিলাসিতাকে বেমালুম অস্বীকার করা এবং নাকোচ কোরে দেওয়া। এঁরা সবাই তাই রসসৃষ্টির জগতে বরাবর

লেখক কোনো দেশেই নিশ্চিন্ত আরামে বাস করবার আশা কোরতে পারেন না।

ডি এইচ্ লরেন্স্ দাম্ভিক ছিলেন, এ-কথা সবাই শুধু জান্তোই না, সবাইকে বেশী কোরে সে কথা বুঝিয়ে দিতেই তিনি চেষ্টা কোরতেন। কিন্তু সে-দাম্ভিকতার যোগ্যতা তাঁর যথেষ্ট ছিল; কিন্তু অহঙ্কার করার অধিকাব আছে ব'লেই যদি কেউ তার সমাজ ও দেশকে মুহুর্মুহু খোঁচাতে থাকে, তবে তাব অন্য কোনো দুর্গতি না হোক্, অন্ততঃ উল্টো খোঁচা খেয়ে মনের শান্তিব প্রচুব ব্যাঘাত হোয়েই থাকে।

এ-সংসাবে যাবা অদৃষ্টেব বিরুদ্ধে প্রতিযোগ কবাটাই ববণ কোবে নেয, স্বভাব তাদেব প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করবাব ক্ষমতা দেয অবশ্যি; কিন্তু তাদেব জাত মাবা যাবেই। তাই লবেন্সকে জীবনেব বেশীব ভাগ সময়ই একবকম একঘরে হোযেই থাক্তে হোযেছিল।

মৃত্যুর পব আজকাল লবেন্স্ সম্বন্ধে অনেকবই কৌতূহল দেখা যাচ্ছে, এবং তাঁব সাহিত্য সম্বন্ধে লোকমতেবও একটু একটু পবিবর্ত্তন হোযেচে। লবেন্সেব প্রতিভাকে আগেও কেউ অস্বীকার কবেনি, এখনও কোর্চে না, শুধু দুঃখেব বিষয এই যে, গ্রহেব ফেরে লবেন্স্কে জীবন ভবেই খাঁচাব ভেতব অবরুদ্ধ সিংহেব মতো সবসময ছট্ফট্ ও মাঝে মাঝে হুঙ্কাব কোবতে হোযেচে। সমাজের শাসনকে মেনে নেওয়ার, যদিও কোনো প্রবৃত্তিই তাঁর ছিল না, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ ভাবে কাটিয়ে ওঠার মতো ক্ষমতা-ও তাঁব ছিল না। আবাব, তাকে শুধু পাশ কাটিয়ে চল্লে যে সেটা কাপুরুষতা হোতো তাও খুব ভালো কোরে লরেন্স্ বুঝ্তেন।

লরেন্‌স্‌কে খোঁচালে আর রক্ষা ছিল না : খোঁচার ঘায়ে ঘায়েল হোলে-ও বিষাক্ত বাক্যবাণ তাঁর তূণে সব সময় মজুত থাকতো। নেপথ্যে আত্মগোপন কোরে হয়তো তিনি আত্মরক্ষা কোরতে পারতেন, কিন্তু আত্মগোপন করাটা ছিল তাঁর রুচি-বিরুদ্ধ, এবং কোরতে গেলে যে নিজের কাছেই নিজের সাহিত্যিক-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হোয়ে যেতো তিনি তা-ও খুব ভালো কোরেই জানতেন।

বাইরের লোকের কাছে অসামাজিকতাই ছিল লরেন্‌সের সব চেয়ে বড় অপরাধ : যে-অপরাধটা আজ অল্প-বিস্তর সব অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদেরই একটা বিশেষত্বের ভেতর দাঁড়িয়ে গেছে। লরেন্‌সের আরো একটা দোষ ছিল : অসহিষ্ণুতা। অধৈর্য্যের আতিশয্যে নিজে যা বুঝেছেন সেটাই একমাত্র সত্যি ব'লে প্রচার কোরতেন; এবং তার সঙ্গে যুক্তি, অযুক্তি, পরিহাস, বিদ্রূপ মিশিয়ে দেবার বিদ্যায় লরেন্‌স্‌ ছিলেন অতুলনীয়। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী : উপন্যাস, ছোট-গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভ্রমন-কাহিনী সব কিছুরই রচনায় ছিল তাঁর পারদর্শিতা। যে-ধরণের রচনাই হোক্‌ না কেন, প্রত্যেকটার মধ্যেই তাঁর ঐ প্রচণ্ড আত্মশ্লাঘার উন্মত্ততা প্রকাশ পেয়েচে।

লরেন্‌সের কোনো লেখারই রং ফিকে নয়; একেবারে উগ্র হল্‌দে : যেমন তার তেজ, তেমন তার ঝাঁজ। প্রত্যেক-টাতেই একটা ব্যগ্র, উদ্ধত, নির্ভীক, দুর্দ্দমনীয় রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্যি তাঁর লেখায় মৃদু ও করুণ কমনীয়তার একটু একটু আভাষ পাওয়া যায়; বিশেষ কোরে, তাঁর কতগুলোর কবিতার মধ্যে। *Love on the Farm*

কবিতায় প্রতীক্ষারতা একটী তরুণী গালে দু'টো হাত বিন্যস্ত কোরে জানলা দিয়ে মুখ বার কোরে আছে : হাত দু'টো দেখে কবি লরেন্স্ কল্পনা কোরেচেন তারা যেন সোনার আলো মুঠো কোরে ধরে আছে : গোধূলির হাওয়ায় সে আলো মানব-হৃদয়ের বুক চিরে বেরিয়ে এসেচে। সন্ধ্যাকালের রক্ত-রাগের পানে তাকিয়ে কবি ভাব্‌চেন : বুঝি আহত প্রেম নীলিমার বুকে গিয়ে মিলিয়ে গেছে : "T's the wound of love goes home."

আর একটা কবিতায় (*Street Walkers*) লরেন্স্ অশান্ত-সাগর-সৈকতে স্বর্গ রচনার স্বপ্ন দেখ্‌চেন : "A paradise on the shores of the ceaseless ocean" *Renascence* নামক কবিতায় কবি বল্‌চেন : সংসারের হাসি-কান্নার বাইরে যে-একটা অপূর্ব্ব জগৎ র'য়েচে সে-জগতে যত দ্বন্দ্বই থাক্ না কেন, সে-দ্বন্দ্বের ভেতর একটা প্রচ্ছন্ন মিল র'য়েচে; এবং তার যেটুকু অমিল সেটা নদীর পথ-চলায় আঁকি-বাঁকির মতো সুদূর সাগরে গিয়ে মিলে-যাওয়ারই অমিল : "Like all the clash of a river moves on to sea." *Humming Bird* নামে একটা কবিতায় গুণ্‌গুণ্‌-করে গাওয়া পাখীকে উদ্দেশ্য কোরে লরেন্স্ লিখ্‌চেন : মানুষের বহুভাগ্য যে সে পাখীটাকে দেখে "through the wrong end of the Telescope of Time," নইলে সে-পাখীর গানে কী-ই বা এমন কবিত্ব আছে! আবার সেই বিদ্রূপ।

লরেন্স্-সাহিত্যের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ হোয়েচে অশ্লীলতার অভিযোগ। যারা হয়তো কস্মিন কালেও লরেন্সের একখানা বই-ও পড়ে দেখেনি, তারাও অন্য

লোকের কথা শুনে তাঁর লেখায় 'নোংরামি ছাড়া আর কিছু নেই' এরূপ মন্তব্য জাহির কোরে আসচে। এ থেকেই বোঝা যায় লরেন্সের অশ্লীলতার বদনামটা কতদূর ছড়িয়ে গেছে।

লরেন্স্ অপবাদটা স্বীকার-ও করেননি, অস্বীকারও করেননি; বরঞ্চ নিজের কোনো রকম সাফাই না কোরে প্রচলিত অর্থে যাকে অশ্লীলতা বলা হয়, সেইটেকেই বেশী কোরে তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধে নাড়াচাড়া কোরেচেন। তাঁর মতে, সাহিত্যে অশ্লীলতার কথা তোলাই বাহুল্য, এবং তুললেও তা শুধু নির্ব্বুদ্ধিতা ও সঙ্কীর্ণতাই জ্ঞাপন করে। বরাবর সাহিত্যে অশ্লীলতার কথা উঠেচে বিশেষ ভাবে দুটো দিক্ দিয়ে: প্রথমতঃ, তথাকথিত ভদ্রসমাজে অব্যবহার্য্য এবং সেহেতু কথাবার্ত্তায় অপ্রযোজ্য শব্দের প্রয়োগ, এবং দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক বা যৌন-সম্পর্কিত ব্যাপারের খোলাখুলি বর্ণনা।

লরেন্স্ বলতে চান যে, সাহিত্যে এই দুটো অপবাদের জন্য সাধারণতঃ লোকে যখন তাঁর ওপর অশ্লীলতার আরোপ কোরেচে এবং সঙ্গে সঙ্গে নাক সিঁটকিয়েচে, তখন সেটা তাদের নিজেদেরই মনের অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরামি-ই বুঝিয়েচে। যৌন-সম্ভোগ ঘটিত অবস্থার বিশদ বিশ্লেষণ বইতে পড়লে যদি কারুর চিত্তের অব্যবস্থিতত্তা ঘটে, সেটা বইর দোষ নয়; সেটা যে পড়ে তারই কুশ্রী রুচির পরিচায়ক। এই সম্পর্কে আরো একটু পরিষ্কার কোরে লরেন্স্ বলেচেন যে, বর্ত্তমান উচ্চ-সভ্যতার যুগেও মানুষের ভেতরটা আদিম কালের জন্তুর মতো র'য়ে গেছে:

তার কোনই পরিবর্তন হয়নি : এখনও তার র'য়েচে শরীর ও শারীরিক কার্য্য-কলাপের ওপর একটা পশুসুলভ ভীতি। কাজেই, মানুষ যতদিন অন্তরে থাক্‌বে কলুষিত ও অপবিত্র, ততদিন কদর্য্যতাকে সে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারবে না। অন্তরের নগ্ন অশ্লীলতাকে ঢাকার জন্যই তাই সে এতো শাসন-অনুশাসন বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা কোরেচে ; এবং অশ্লীলতার এই বিভীষিকা থেকে নিজেকে বাঁচাবার উপায় না বার কোরতে পারলে, সে নির্ভীক, স্পষ্টভাষী সাহিত্যিকের ওপর অত্যাচারই কোরে যাবে।

Lady Chatterley's Lover-এর মুখপত্রের উপসংহারে লরেন্স্ লিখ্‌চেন :

"Keep your perversions if you like them—your perversions of smart licentiousness, your perversions of a dirty mind. But I stick to my book and my position : Life is only bearable when the mind and the body are in harmony and there is a natural balance between them and each has a natural respect for the other."

তার মানে এই যে, আজ অশ্লীলতা মানব-জীবনের পরতে-পরতে ছড়িয়ে পড়েচে এবং মানুষের দেহ ও মনের ভেতরের স্বাভাবিক সামঞ্জস্যটা নষ্ট হোয়ে গেছে ব'লেই অশ্লীলতার এই উগ্র, বীভৎস চেহারা দেখ্‌তে হোচ্চে। মানুষের যৌন-সম্ভোগটা আজ শুধু শারীরিক প্রক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হোয়েচে ; তাতে রসবোধ নেই, সৌন্দর্য্য-স্পৃহা

নেই, মনের কমনীয়তা নেই। সমাজের বাহ্যিক শ্লীলতা তাই হোয়ে দাঁড়িয়েচে হৃদয়ের অশুচিতার রূপান্তর।

এখনো, এ-যুগেও মানুষের মন কর্দ্দমাক্ত, পাঁকে নিমগ্ন, কৃমি-ঘন; তাই সে তার নিজের আসল প্রতিকৃতি সাহিত্যে চিত্রিত হোতে দেখলেই চিৎকার কোরে ওঠে। লরেন্স্ তাই চেষ্টা কোরেচেন শুচিতার বহিরাবরণ উন্মুক্ত কোরে দেখাতে মানুষের দেহ-লালসার ঘৃণিত ক্ষুধা, এবং আর চেয়েছেন উপহাসাস্পদ কোরে দেখাতে সমাজের পবিত্রতার ভাণকে ও শুচিতার ছলনাকে। অবিশ্যি, কুৎসিত রূপকে লরেন্স্ অনেক জায়গায় আবেগের আতিশয্যে, রাগে ও ক্ষোভে অঙ্কিত কোরতে গিয়ে একটু বিকৃত কোরে ফেলেচেন: সেইখানেই হোয়েচে লরেন্সের আর্ট একটু খর্ব্ব।

তরুণীর নবনীত তনুর তলে যে বীভৎস কাঠামোটা, যে শুষ্ক কঙ্কাল র'য়েচে, সেটা অনেক সময় লরেন্সের বইর পাঠকের চোখকে একটু আহত কোরবে হয়তো। হয়তো কোনো প্রলুব্ধ, বাসনা-পঙ্গু নির্লজ্জ কামুকের চেহারা দেখে পাঠক একটু আঁৎকে উঠবে। কিন্তু যেখানে-যেখানে লরেন্সের সত্যিকারের শিল্প-সৃষ্টি র'য়েচে, তার সৌন্দর্য্য বুঝতে পারলে. পাঠকের পক্ষে অশ্লীলতার এই বাড়াবাড়ি তেমন অসহনীয় হবে না। কেননা, অশ্লীলতা লরেন্স্-সাহিত্যের একটা দিক্ মাত্র: কী করে মানুষ নিজের সত্তা উপলব্ধি ও লাভ কোরতে পারবে তারই আলোচনা ও পথ-নির্দ্ধারণই লরেন্সের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দান।

লরেন্স্ দেখাতে চেয়েচেন যে, মানুষ তার সব কুশ্রীতা ও ব্যর্থতা থেকে মুক্তিলাভ কোরতে পারে যদি সে নিজের

সত্তাকে হারিয়ে না ফেলে। সংসার-সংগ্রামে মানুষ যদিও একা, ঐ একাকীত্বই তার সব চেয়ে বড় সম্বল: এ নিঃসঙ্গতাটুকুই শুধু তার নিজস্ব। *Aaron's Rod*-এর শেষ পরিচ্ছেদে লরেন্স্ তাঁর উপন্যাসের ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত নায়ককে একাকীত্বের আশ্বাস-বাণীতে উদ্বুদ্ধ কোরে তুলতে চেষ্টা কোরেচেন। এ্যারনকে বল্‌চেন: "তুমি এখন থেকে হও নির্লিপ্ত ভিক্ষুর মতো: যাও, মনের নীড় গিয়ে বাঁধো ধরণীর বহির্লোকে, তোমার অন্তরের দৃষ্টিলোকে। ঊর্ণনাভ-বৃত্তি ছেড়ে দাও, আর নিজের চারদিকে স্বার্থের জাল বুনো না, মৃত্যুহীন, শঙ্কাহীন প্রাণ নিয়ে, সব আতঙ্ক, কুণ্ঠা, ভয় ত্যাগ কোরে, চেষ্টা করো খুঁজে বার কোরতে নিজের সত্তাকে—তোমার অন্তরের নিভৃত গুহায়। তুমি পশু নও, দস্যু নও, ক্ষুদ্র জীব-ও নও: তুমি শিল্পী। তুমি সৃষ্টি করো তোমার নিজের নিঃসঙ্গ আত্মার অজস্রতা। তুমি সৃজন কালে অচেতন ছিলে, আজ হও সচেতন: স্থূলতম দৈহিকতা আর কোনো দিনও তাহোলে তোমায় স্পর্শ কোরতে পারবে না।"

দুঃখের বিষয় এই যে, ডি এইচ্ লরেন্সের এই আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান আরো বেশী কোরে প্রস্ফুটিত হওয়ার অবকাশ পায় নি। যে-যুগের যে-সমাজে তিনি জন্মেছিলেন সে-সমাজ তাঁর প্রতিভাকে কেবল খর্ব্বই কোরতে চেষ্টা কোরেচে। এ সমাজকে অবিশ্যি লরেন্স্ চাননি, ভালোবাসেননি-ও; কিন্তু একে সম্পূর্ণভাবে নতুন চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত করবার দীর্ঘ সুযোগ-ও তাঁর হোয়ে ওঠে নি।